বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন

সরজিত কুমার চট্টোপাধ্যায়

-- দেশভাগ এবং অব্যাহত সাম্প্রদায়িক বিভেদ

।। এক ।।

মানুষ এক সমাজিক জীব। সভ্যতার আদিলগ্ন থেকেই মানুষ সমাজবদ্ধ হয়ে বাস করছে। সে একা বিচ্ছিন্নভাবে বাঁচতে পারে না। তাকে এক গোষ্ঠী বা সম্প্রদায়ের সঙ্গে বাস করতেই হবে। সম্প্রদায়ই দেয় তাকে পরিচয়, যোগায় তার বেঁচে থাকার রসদ, হয়ে ওঠে তার অবলম্বন। তাই নিজ সম্প্রদায়ের প্রতি প্রত্যেকেরই একটা টান থাকবেই একটা দুর্বলতা থাকবেই এবং এতে কোনো অন্যায়ও নেই।তবে সে যদি সম্প্রদায় ছাড়া আর কিছুই না বোঝে, সেটাই যদি তার ধ্যান - জ্ঞান হয়, যেন তার সম্প্রদায় ছাড়া এ জগতে আর কিছুরইঅস্তিত্ব নেই, তাতেই যদি সে সম্পূর্ণরূপে আবিষ্ট হয়, তার সমস্ত কাজই নিজ সম্প্রদায় - ভিত্তিক হয়, তখন অন্য সম্প্রদায়ের সমস্ত কার্যকলাপকেই সে দেখবে সন্দেহের চোখে এবং অন্য সম্প্রদায়ের উপর এক বৈরীভাব উৎপাদিত হবে; মনে হবে নিজ সম্প্রদায়ের উন্নতিও অগ্রগতি দ্ধ হচ্ছে অন্য সম্প্রদায়ের জন্যই। কল্পিত, মনগড়া, মিথ্যা অভিযোগের ফিরিস্তি বানানো হবে, কৃত্রিম উল্লঙঘ বাধার সৃষ্টি করা হবে এবং এক হীনমন্য মানসিকতা তৈরি হবে। সাম্প্রদায়িকতা এইভাবেই আরম্ভ হয়।

যদিও 'সাম্প্রদায়িকতা' কথাটা এসেছে 'সম্প্রদায়' থেকে তবুও সম্প্রদায় ও সাম্প্রদায়িকতার মধ্যে এক বিশাল পার্থক্য আছে। সম্প্রদায় হতে পারে ধর্ম, জাত, বর্ণ, ভাষা ইত্যাদি ইত্যাদি ভিত্তিক। তবে সাধারণতঃ সাম্প্রদায়িকতা বলতে ধর্মীয় সাম্প্রদায়িকতাই বোঝায়। প্রখ্যাত ইতিহাসবিদ বিপন চন্দ্রের মতে "খুব সরলভাবে বললে সাম্প্রদায়িকতা হচ্ছে একটা বিশ্বাস যেহেতু কিছু লোক এক বিশেষ ধর্মমতে বিশ্বাসী এবং তাদের সামাজিক রাজনৈতিক স্বার্থও হবে এক।" ধর্মীয় সম্প্রদায়িকতা কোনো না কোনোভাবে পৃথিবীর সর্বত্রই ছিল, আছে এবং থাকবে।

একথা সর্বজনস্বীকৃত যে যত রকম 'প্রাথমিক' বন্ধনের ভিত্তিতে গোষ্ঠীচেতনা দানা বাঁধতে পারে তার মধ্যে সব থেকে শক্তিশালী হল ধর্মের বন্ধন। তবে এটা মনে রাখা ভাল যে নিছক ধর্মীয় গোষ্ঠীচেতনা সাম্প্রদায়িকতা থেকে ভিন্ন। সুমিত সরকারের মতে সাম্প্রদায়িকতা ধর্মীয় গোষ্ঠীচেতনার উপর নির্ভর করার পর আরও কয়েক পা এগিয়ে একটি বিশিষ্ট গোষ্ঠীর স্বার্থ ও মূল্যবোধকে সর্ব অবস্থায়অন্য গোষ্ঠীর বিরোধী মনে করে। ফলে 'সাম্প্রদায়িক' মানুষ মনে করে বা কল্পনা করে নেয় যে অন্য সম্প্রদায়ের মানুষ তার জন্য বিপজ্জনক। ফলে একটি গোষ্ঠী এবং অন্যটির ভিতর সংঘাতের অনিবার্যতা সর্বপ্রধান হয়ে ওঠে। যদিও শিল্প সম্প্রসারণের সঙ্গে সম্প্রদায় ভিত্তিক সমাজ ত্রমশ সমিতি বা শ্রেণী -- ভিত্তিক সমাজে পরিণত হবার দিকে এগোচ্ছে, এটা বলা বোধহয় অন্যায় হবে না যে স্বদেশি এবং স্বদেশি যুগোত্তর পর্বে, এমনকি স্বাধীন ভারতেও হিন্দু ও মুসলিমসম্প্রদায়ের বেশ কিছু গুত্বপূর্ণ অংশে এই সাম্প্রদায়িক মনোভাব পরিলক্ষিত হয়।

ভারতবর্ষ নানা ধর্ম, নানা মত, নানা ভাষা, নানা জাতের পীঠস্থান। বিশাল এই দেশ। ভৌগোলিক ব্যবধানও দুস্তর। এদের প্রত্যেকেরই একটা নিজস্ব শক্তি আছে এবং তা' অনেকক্ষেত্রেই অন্যটির পরিপন্থী। তা' সত্ত্বেও স্বাধীনতা আন্দোলন যাতে দানা বাঁধতে পারেতার জন্য তৎকালীন নেতারা বেশ ভেবেচিন্তেই এই সব বিভিন্ন শক্তির সাহায্য নিয়েছিলেন। তার ফলে

যে জাতীয়তাবাদের উদ্ভব হয়েছিল তাকে খণ্ড জাতীয়তাবাদও বলা যেতে পারে -- যেমন হিন্দু জাতীয়তাবাদ, মুসলিম জাতীয়তাবাদ, শিখ জাতীয়তাবাদ। এটা ছিল ধর্মের ভিত্তিতে। যেমন মহামতি তিলক ভারতীয় জাতীয়তাবাদ, হিন্দু পুনরুত্থানের মনোভাব জাগ্রত করেন 'গণেশ পূজা' ও 'শিবাজী উৎসবের' অনুষ্ঠানে। প্রথম শিবাজী উৎসব হয় ১৮৭৯ সালে মহারাষ্ট্রে। সেই অনুপ্রেরণায় কলিকাতায় এই উৎসব অনুষ্ঠিত হয় ১৯০২ সালে। ১৯০৪ সালে রবীন্দ্রনাথ লিখছেন 'শিবাজী উৎসব' কবিতা। এইসব উৎসবের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল হিন্দু গরিমার কথা বলে হিন্দুদের একসূত্রে বাঁধার চেষ্টা। তেমনি ভাষা - ভিত্তিক বা স্থান - ভিত্তিক জাতীয়তাবাদও ছিল-- যেমন বাঙালি জাতীয়তাবাদ। যদিও আপাতদৃষ্টিতে এইসব খণ্ড জাতীয়তাবাদ গুলি একে অন্যের পরিপন্থী, কিন্তু তা' যাতে একে অন্যের পরিপূরক হয় তার দিকেই স্বাধীনতা আন্দোলনের নেতাদের মনোযোগ ছিল এবং তাঁরা মনে করতেন একজন ভাল হিন্দু বা ভাল মুসলমান এবং একজন ভাল ভারতীয়ের মধ্যে কোন সংঘাত নেই। যেমন নেই বাংলাভাষী জনজাতির সঙ্গে তামিল ভাষাভাষী জনজাতির অর্থাৎ তাঁরা খণ্ড জাতীয়বাদগুলির ভালো দিকগুলোর দিকেই মনোযোগ দিতেন; তাদের দেখতেন এক প্রকাণ্ড পুষ্পস্তবকের মধ্যে এক একটা ফুল হিসাবে। যখন নানাবর্ণের নানাসুগন্ধের ফুলগুলি একসূত্রে বাঁধা থাকে তখনই পরিণত হয় এক চমৎকার পুষ্পস্তবকে। তখন তার কোনো ফুলেরই নিজস্ব অস্তিত্ব থাকে না। অর্থাৎ খণ্ড-জাতীয়বাদগুলি বিলীন হয় ভারতীয় জাতীয়তাবাদে সাংস্কৃতিক ঐক্যের সুত্র। খণ্ড - জাতীয়তাবাদ থেকে আস্তে আস্তে ভারতীয় জাতীয়তাবাদে উত্তরণ ঘটেছিল স্বাধীনতা আন্দোলনের মধ্য দিয়ে।

আমাদের স্বাধীনতা আন্দোলনের নেতারা যে কারণে খণ্ড-জাতীয়তাবাদকে প্রশ্রয় দিয়েছিলেন, তা ঠিক উল্টো কারণে ব্রিটিশ রাজ ঐ খণ্ড চেয়েছিল। তারা যে এই কাজে সর্বাংশে সফল হয়েছিল তা তো আমরা দেখতেই পাচ্ছি।

১৮৫৭ সালের সিপাহি বিদ্রোহ, যাকে স্বাধীনতার প্রথম যুদ্ধ হিসাবেও গণ্য করা হয়, ইংরেজ শাসকদের চোখ কান খুলে দেয়। তারা দেখল যে সিপাহি বিদ্রোহের অন্যতম কারণ হচ্ছে ভারতীয় সৈন্যদলে উচচবর্ণ হিন্দুদের--- ব্রাহ্মণ এবং রাজপুতদের অধিপত্য তাই উচচবর্ণের হিন্দু যাতে আর সৈন্যদলে যোগদান না করতে পারে তার জন্য ইংলন্ড জাগরিত হল। ব্রিটিশ শাসকদের বোঝান হল তাদের যদি এদেশে রাজত্ব করতে হয় তবে তাদের 'বিভেদ ও শাসন' এই নীতি গ্রহণ করতেই হবে তারা তখন থেকেই জাতভিত্তিক নীতি প্রয়োগ করলে সকল কাজে। বস্তুত তাদের ২০০ বৎসরের শাসনকালে বিশেষত ১৮৫৭-এর প্রশাসনিক স্তরে, আইন প্রণয়নে, আর্থিক নীতি ও শিক্ষা বিষয় এবং বিশেষ করে রাজনৈতিকভাবে যে সমস্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করছেন তার নিহিতার্থ হচ্ছে ধর্ম - ভিত্তিক ও জাত-ভিত্তিকবিভাজন নিয়ে যত সম্ভব ত্বরান্বিত করা যাতে এই বিভেদের সুযোগ নিয়ে তারা পরম নিশ্চিন্ত নিজেদের রাজ্যপাট চালিয়ে যেতে পারে। তারা যে এই কাজে বিশেষ সফল হয়েছিল তা বলার অপেক্ষা রাখে না তাদের নীতি পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়েছিল ১৯৪৭ সালে যখন তারা ধর্মের ভিত্তিতে ভারত ভাগ করে এই দেশ ছেড়ে চলে যায়।

।।দুই ।।

১৯৪৭ সালে যে কাজ সাধিত হয় তারই একটা রূপরেখা আমরা দেখতে পাই ১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গে। বঙ্গভঙ্গের সময় সমগ্র ভারতের এবং বাংলা প্রেসিডেন্সির রাজধানী ছিল কলিকাতা। তৎকালীন বাংলা প্রেসিডেন্সির ভৌগোলিক সীমানার মধ্যে ছিল বিহার ও ওড়িশা। সুতরাং কলিকাতার একটি বিশিষ্ট ভূমিকা ছিল ভারতের রাজনীতিতে। ভারতের বড়লাট লর্ড কার্জন (১৮৯৯ সালে জানুয়ারি মাস থেকে ১৯০৪ সালের এপ্রিল মাস এবং ১৯০৪ সালের ডিসেম্বর থেকে ১৯০৫ সালের নভেম্বর অবধি) লক্ষ্য করলেন যে ইংরাজি শিক্ষায় শিক্ষিত বাঙালি হিন্দু উচচ এবং মধ্যবিত্ত শ্রেণীর নেতারা ব্রিটিশ শাসনের বিদ্ধে এক শক্তিশালী আন্দোলন গড়ে তুলছেন; আর বাংলা হলো এই আন্দোলনের অন্যতম কেন্দ্র। কলকাতা থেকেই এই আন্দোলন পরিচালনা করেন নেতৃবৃন্দ। এই শহর ছিল কংগ্রেসের সমস্ত কার্যের ভরকেন্দ্র। সুতরাং বাংলাকে দ্বিখণ্ডিত করার প্রয়োজন অনুভূত হয় ১৯০৪-এর ১৭ ফেব্রুয়ারি কার্জন ভারত সচিব ব্রডরিককে লেখেন---

The Bengali, who like to think themselves a nation, and who dream of a future when the English will have been turned out, and the Government House, Calcutta, of course bitterly resent any disruption that will be likely to interfere with the realization of this dream. If we are weak enough to yield to their clamor now, we shall not be able to dismember or reduce Bengal again.…

এই পত্র থেকেই বঙ্গভঙ্গের আসল যে উদ্দেশ্য পরিষ্কার হয়ে ওঠে, তা' হল বাঙালি দমন। বস্তুত ব্রিটিশ শাসকরা বাংলা ভাগ করেছিল অনেকগুলো উদ্দেশ্য মাথায় রেখে। প্রথমত বাংলা বাঙালি -- যে বা যারা ব্রিটিশবিরোধী রাজনৈতিক সংগ্রামের পীঠস্থান এবং পুরোভাগে তাদের যে কোনোভাবেই হোক ধবংস করা যাতে ভবিষ্যতে তাদের সামনে বিপদরূপে দেখা না দেয়। দ্বিতীয়, বাংলাকে দ্বিধাভিত্ত করে বাংলার অর্থনীতিকে পঙ্গু করে দেওয়া এবং তৃতীয়ত, বাংলার দুই প্রধান ধর্মসম্প্রদায় -- হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে ধর্মভিত্তিক বিভেদ ও অনৈক্য আরও উস্‌কে দিয়ে, তাদের মধ্যে আভ্যন্তরীণ বিরোধ বাড়িয়ে দিয়ে নিজেদের রাজস্ব মসৃণভাবে আরও অনেকদিন চালিয়ে যাওয়া।

কার্জনের সময় বঙ্গভঙ্গ কার্যকর হলেও তিনিই এই প্রস্তাবের জনক নন। ১৮ শতাব্দীর মধ্যভাবে বাংলা প্রেসিডেন্সির ভৌগোলিক সীমানা বিস্তৃত হয়েছিল উত্তর - পশ্চিমে শত দ্রু নদীর তীর অবধি, উত্তর - পূর্বে আসাম এবং দক্ষিণ - পূর্বে আরাকান অবধি। ১৮৩৩ এর চার্টার এ্যাক্ট অনুযায়ী তৈরি হল আগ্রা প্রেসিডেন্সি পরে যার নাম পাল্টে হয় উত্তর - পশ্চিম প্রদেশ ১৮৩৫ সালে। আরাকান বর্মার অঙ্গীভূত হয় ১৮৬২ সালে। তবুও বাংলা প্রেসিডেন্সির বিশাল আয়তন প্রশাসনিক অসুবিধা সৃষ্টি করে। ১৮৬৬ এর দুর্ভিক্ষের সময় তা' আরও প্রকট হয়। বঙ্গভঙ্গের প্রথম প্রস্তাব আসে বড়লাট জন লরেন্সের কাছ থেকে। তিনি আসাম ও তার সন্নিহিত অঞ্চলগুলিকে আলাদা করতে বলেন। সেই মত ১৯৭৮ সালে বাংলাভাষী সিলেট, কাছাড় ও গোয়ালপাড়া জেলা সহ আসাম এক আলাদা চিফ কমিশনারের অধীন প্রদেশ বলে ঘোষিত হয়। ১৮৯৬ সালে এর চিফ কমিশনার স্যার উইলিয়াম ওয়ার্ড প্রস্তাব দেন সমগ্র চট্টগ্রাম বিভাগ এবং ঢাকা ও ময়মনসিং জেলাকে আসামের সঙ্গে যুত্ত করতে, কিন্তু তাঁর পরের চিফ কমিশনার স্যার এইচ কটন এই প্রস্তাবের বিরোধিতা করেন ১৮৯৭ সালে। ১৯০১ সালে ওড়িষাকে বাংলা থেকে বিচ্ছিন্ন করে মধ্যপ্রদেশের সঙ্গে যুত্ত করে দেবার চেষ্টা করেন মধ্যপ্রদেশের চিফ কমিশনার এন্ড্রজ ফ্রেজার। কিন্তু কতিপয় দেশহিতৈষীর বাধাদানে এই অপচেষ্টা সফল হয়নি। এন্ড্রু ফ্রেজার বাংলার ছোটলাটহিসাবে আসার পর এই পরিকল্পনা সামান্য অদলবদল করে বড়লাট কার্জনের কাছে পেশ করেন ১৯০৩ সালে ১৮ মার্চ। ফ্রেজারের পরিকল্পনাটি কার্জন গ্রহণ করেন।

১৯০৩ সালের ১০ নভেম্বর ভারত সরকারের স্বরাষ্ট্র সচিব হাবার্ট রিজলে হস্তান্তর বিষয়ক একটা খসড়া পত্র দেন কার্জনকে। এই প্রস্তাবে বলা হল চট্টগ্রাম বিভাগ, পার্বত্য ত্রিপুরা, ঢাকা ও ময়মনসিং জেলা আসামে যাবে, ছোটনাগপুর যাবে মধ্যপ্রদেশ এবং তার বদলে বাংলা পায় মধ্যপ্রদেশ থেকে সম্বলপুর ও গঞ্জাম জেলা এবং মাদ্রাজ থেকে ভিজাগাপত্তন। রিজলে তাঁর নোটে বর্তমানে বহুল পরিচিত সেই পরম সাম্রাজ্যবাদী মন্তব্য করেন।

Bengal united is a power. Bengali divided will pull several different way s…one of our main objects is to split up and thereby weaken a solid body of opponents to our rule.

১৯০৩ সালের ৩ ডিসেম্বর ভারত সচিবের অনুমোদন লাভ করে এই চিঠিটি সর্বপ্রথম "রিজলে পেপার" নামে সর্বসাধারণের জন্য প্রকাশিত হয়।

১৯০৪ সালে ফেব্রুয়ারি মাসে কার্জন নিজ মতের পক্ষে পূর্ববঙ্গবাসীদের টেনে আনার জন্য সেখানে সফরে যান এবং ভ্রান্ত যুত্তি, ভয় ও প্রলোভন দেখান। পরিকল্পনার নানা অদলবদল ঘটতে থাকে। পূর্ববঙ্গ ভ্রমণের সময় কার্জন সমগ্র রাজশাহী বিভাগ (দার্জিলিঙ বাদে, তবে মালদা সহ) ও ঢাকা বিভাগের বাকি জেলাগুলিকেও আসামের সঙ্গে জুড়ে দিলেন। ১৯০৪ সালের ৬ এপ্রিল ছোটলাট এন্ড্রু ফ্রেজার ভারত সরকারকে এক নোটে আসামের সঙ্গে পাবনা, বগুড়া ও রংপুরকে সংযুত্ত করার কথা বলেন।

১৯০৫ সালের ২ ফেব্রুয়ারি কার্জন ভারতসচিব ব্রডরিককে বঙ্গ ব্যবচ্ছেদের চূড়ান্ত পরিকল্পনাটি প্রেরণ করেন। ১৯০৫ সালের ৯জুন ভারতসচিবের ডেসপ্যাচে বঙ্গব্যবচ্ছেদ পরিকল্পনায় তাঁর সম্মতি জ্ঞাপন করেন। ১৯ জুলাই বঙ্গভঙ্গ বিষয়ে রচিত কার্জনের সরকারী আদেশনামা প্রকাশিত হয় সিমলা থেকে। ১ সেপ্টেম্বর বঙ্গভঙ্গের আনুষ্ঠানিক ঘোষণা করা হয় এবং ঠিক হয় ১৯০৫ এর ১৬ অক্টোবর, ৩০ শে আশ্বিন থেকে বঙ্গ ভঙ্গ কার্যকর হবে।

বাংলা প্রেসিডেন্সির মধ্যে ছিল বঙ্গভঙ্গ বা বেঙ্গল প্রপার, বিহার, ওড়িষা, ছোটনাগপুর, আর এরা ছিল পঁয়তাল্লিশটি জেলায় বিভত্ত। নবগঠিত পূর্ববঙ্গ বর্তমান উত্তরবঙ্গের সবটাই (দার্জিলিং বাদে) এবং আসাম বাংলা হারাল ১৫টি জেলা। এই জেলাগুলো হল ঢাকা, ময়মনসিং, ফরিদপুর, বাখরগঞ্জ, ত্রিপুরা, নোয়াখালি, চট্টগ্রাম, পার্বত্য চট্টগ্রাম, রাজশাহী, দিনাজপুর জলপাইগুড়ি, রংপুর, বগুড়া, পাবনা ও মালদহ। নবগঠিত আসাম ও পূর্ববঙ্গের জনসংখ্যা ৩ কোটি ১০ লক্ষ

, এর মধ্যে বেশির ভাগই ইসলাম ধর্মাবলম্বী (১ কোটি ৮০ লক্ষ) এবং হিন্দুরা ১ কোটি ২০ লক্ষ।
বাংলা প্রেসিডেন্সির অবশিষ্ট অঞ্চলে রইল ছোটনাগপুর, বিহার, ওড়িষা, বর্তমান পশ্চিমবঙ্গের অধিকাংশটাই (মালদহ, দিনাজপুর, জলপাইগুড়ি ও কুচবিহার বাদে), যশোহর এবং খুলনা। এর লোকসংখ্যা হল ৫ কোটি ৮০ লক্ষ, তার মধ্যে হিন্দু হচ্ছে ৪ কোটি ২০ লক্ষ এবং মুসলমান ৯০ লক্ষ। বাঙালি হিন্দুরা হল নবগঠিত আসাম ও পূর্ববঙ্গে সংখ্যালঘু এবং বাকি বাংলা প্রেসিডেন্সিতে বাঙালিরা ভাষাগতভাবে হল সংখ্যালঘু, কেননা হিন্দি ও ওড়িয়া ভাষাভাষী অনেক লোকই এই অঞ্চলের অধিবাসী।

।। তিন ।।
১৯০৩ সালে যখন বঙ্গ বিভাগের পরিকল্পনা শোনা যেতে থাকে তখন থেকেই তার বিদ্ধে প্রতিবাদ ধবনিত হতে থাকে ব াংলার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে, যা আরও বাড়ে ১৯০৪ সালে। বঙ্গীয় ভূস্বামী সম্প্রদায় গোড়া থেকেই এর বিদ্ধাচরণ করতে থ াকেন। বাংলার ব্যবস্থাপক সভাতেও প্রতিবাদ ধবনিত হয়। স্বাভাবিকভাবেই আন্দোলন তীব্র হয়ে ওঠে ১৯০৫ সালে। কিন্তু সে প্রতিবাদে কর্ণপাত না করে নিজেদের সিদ্ধান্তে অটল থাকতে চাইল প্রশাসন। বড়লাট লর্ড কার্জন বললেন এটা একটা সেটেলড্ ফ্যাক্ট। এই সেটেলড্ ফ্যাক্টকে 'আনসেটেলড্' করে দেবার জন্য দুর্বার গতিতে এগিয়ে এলেন বাংলার ম ানুষ, বিশেষত এলেন ছাত্ররা -- বিদ্যালয় থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের সমস্ত স্তরে --- নেতৃত্ব দিলেন বুদ্ধিজীবী শ্রেণী। লক্ষণীয় যে বুদ্ধিজীবী শ্রেণীর সকল শাখা বা ধারাই এই আন্দোলনে সামিল হলেন। ফলে কবিতা, নাটক, গান, সাহিত্য, শিল্পকলা, বিজ্ঞান, পত্রিকা সম্পাদনা, শিক্ষা -- সর্বত্রই বঙ্গভঙ্গের প্রতিবাদ ধবনিত হল। দেখা দিল এক জনজাগরণের। এই আন্দে ালন ক্রমে ক্রমে পরিণত হল স্বাদেশি আন্দোলনে যার লক্ষ্যে ছিল বিদেশি দ্রব্য বর্জন ও দেশজ পণ্যের ব্যবহার, স্বদেশি শিল্প, স্বদেশি শিক্ষা এবং সর্বোপরি স্বরাজ।
১৯ জুলাই ১৯০৫ সিমলা থেকে ভারত সরকারের বঙ্গের অঙ্গছেদের চূড়ান্ত ঘোষণার পর ১৯০৫ -এর ৭ আগস্ট কলক াতার টাউনহলের বিশাল সভাকে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের জল - বিভাজিকা বলা যেতে পারে। সর্ব - বাঙলার নেতৃমণ্ডলীর আহ্বানে এই জন সমাবেশে বঙ্গভঙ্গের প্রতিবাদে বিলাতী জিনিষ বয়কট অর্থাৎ বৃটিশের বস্ত্রাদি যাবতীয় জিনিষ বর্জনের প্রস্ত াব সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হল। বঙ্গভঙ্গ রহিত না হওয়া অবধি এই সংকল্পে অটুট থাকতে বাঙালি জাতিকে এই যে অনুরে াধ, বিদ্যুৎগতিতে তা সারাবাংলায় ছড়িয়ে পড়ল। রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ ঘোষণা করলেন 'বঙ্গভঙ্গ' আদেশ রদ করতেই হবে। ঋষি অরবিন্দ প্রত্যক্ষ করলেন ভারতের আত্মারূপে ভবানীকে, লিখলেন ''ভবানী মন্দির''। বিপিন চন্দ্র পাল এই বয়কটকে শিক্ষাক্ষেত্রে এবং উপাধি গ্রহণের ক্ষেত্রে প্রয়োগের আহ্বান জানান।
এরপর ১৬ অক্টোবর (৩০শে আশ্বিন) বঙ্গভঙ্গের দিনটিকে রবীন্দ্রনাথের প্রস্তাব অনুযায়ী 'বাঙালির রাখি বন্ধনের দিন' রূপে পালন করা হয়। তিনি অনেকের সঙ্গে ''বাংলার মাটি, বাংলার জল'', যে গানটি এই বিশেষ দিন উপলক্ষেই রচনা করছিলেন গাইতে গাইতে পথ পরিক্রমা করেন। তারপর হিন্দু - মুসলমান জনসাধারণ ভ্রাতৃত্বের প্রতীক হিসাবে পরস্পরের হাতে রাখি পরিয়ে দিল। কবি নিজে পাথুরিয়াঘাটে মুসলিম সাহিসদের হাতে রাখি বেঁধে দেন। এসবের চমৎক ার বর্ণনা আছে অবনীন্দ্রনাথের 'ঘরোয়া' গ্রন্থে । প্রচলিত সামাজিক আচারটিকে রবীন্দ্রনাথ এইভাবে বাঙালির ভ্রাতৃত্ব ও একতার প্রতীকে পরিণত করলেন।
রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর প্রস্তাব অনুযায়ী এইদিন অরন্ধন দিবস হিসাবে পালন করা হয়। তিনি লিখলেন সেই আশর্চ্য সুন্দর উপাখ্যান 'বঙ্গলক্ষীর ব্রতকথা'।
এই দিনটি জাতীয় শোক দিবস হিসাবে পালিত হয় এবং কার্যত তা' বনধের আকার নেয়। বিভিন্ন সূত্র থেকে জানা যায় যে ১২টিচটকল, একটি চিনিকল, সব মিলিয়ে ৭০টি কল - কারখানা শ্রমিক শ্রেণীর সর্বাত্মক ধর্মঘটের ফলে সম্পূর্ণ বন্ধ ছিল। ১১ হাজার গাড়োয়ান সেদিন গ ও মোষের গাড়ি বার করেন নি। ইস্টার্ন বেঙ্গল রেলপথেও প্রায় সম্পূর্ণ ধর্মঘট হয়েছিল। সেদিন অফিস কাছারিতে খুব অল্পসংখ্যক লোকই কাজে যোগ দিতে যায়। শুধু বাজার নয়, ময়রার দোকান, চ ায়ের দোকান, চিঁড়ে - মুড়ির দোকান, বরফের দোকানও ছিল বন্ধ। বউবাজারের সব কাপড়ের দোকান। রাধাবাজার, চীন াবাজার পুরোপুরি বন্ধ। রাস্তাঘাটও অন্যদিনের তুলনায় ফাঁকা। জেটিগুলিতেও এইদিন মাল খালাস করার লোক

মেলেনি।

এই দিনের কর্মসূচির অংশ হিসেবেই ২৯৪ আপার সার্কুলার রোডে ফেডারেশন হলের (বাংলায় নাম মিলন মন্দির) ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করলেন স্বদেশি আন্দোলনের প্রবাদপ্রতিম নেতা আনন্দমোহন বসু। অসংখ্য লোক - এক হিসাবে ৫০,০০০ এই অনুষ্ঠানে যোগ দেয়। তিনি তাঁর লিখিত ভাষণে বলেছিলেন ---

This hall will be a place where all that moulds and from a growing nation, all that uplifts and regenerates the national character and trains it up to their manhood, and every noble impulse shall always find their place at its shrine shall come, as for worship, every member of the Bengalee nation.

আনন্দমোহন বসু ভিত্তিপ্রস্তরটি স্থাপন করার পর তার নিচে একটি কাচের পাত্রে প্রচলিত কয়েকটি মুদ্রা ও 'ইন্ডিয়ান মিরর' 'বেঙ্গলী', 'অমৃতবাজার পত্রিকা' 'হিন্দু পেট্রিয়ট', 'ইন্ডিয়ান নেশন', 'সঞ্জীবনী', 'হিতবাদী', 'বঙ্গ বাসী', 'বসুমতী' ও আরও কয়েকটি পত্রিকা রাখা হল।

শেষ অবধি অবশ্য মিলন মন্দির গঠিত হয়নি। তার জন্য চারটি প্রধান কারণ নির্দেশ করা যায় --- ১৯১১ সালে বাংলার ফের সংযুক্ত হওয়া, উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের মৃত্যু (কারণ তিনি প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে তিনি জমি কেনার খরচ দেবেন), জমির মধ্যে একটা মসজিদ থাকে (যে সমস্যার সমাধান হিন্দু - মুসলিম উভয় সম্প্রদায়ের নেতারা মিলিতভ াবেও করতে পারেন নি) এবং ঝিযুদ্ধ যে কল্পনা নিয়ে এই মিলনমন্দির স্থাপিত হয়েছিল পরবর্তী কালে দেশনায়ক সুভাষচন্দ্র বসুর উদ্যোগে সেই উদ্দেশ্য নিয়েই স্থাপিত হয়েছিল মহাজাতি সদন।

হিন্দুমুসলমান ঐক্য প্রচেষ্টার পাশাপাশি দেওয়া হয় বয়কটের ডাক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, আদালত, সরকারি চাকরির অর্থাৎ এক কথায় সরকার ও যাবতীয় সরকারি পরিষেবাকে পরিহার করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

বঙ্গভঙ্গবিরোধী আন্দোলন এদেশের প্রথম স্বতঃস্ফূর্ত আন্দোলন যার আবেদন ছিল একেবারে তৃণমূলে। অজ্ঞ ধোপা, চাষী, মুদি, মুচি, মিষ্টান্ন বিক্রেতা, পুরোহিত সবাই কোথাও না কোথাও সক্রিয়ভাবে আন্দোলনে সামিল হয়েছিলেন।

বাঁকুড়ার সন্দেশ প্রস্তুতকারীরা প্রস্তাব নেন, কোনো ময়রা বিদেশি চিনি ব্যবহার করলে ১০০ টাকা জরিমানা করা হবে। বীরভূমের সিউড়িতে বাজারের মাঝখানে যাবতীয় সিগারেট কিনে একত্র করে আগুন দেওয়া হয়। পুরোহিতরা ঘোষণা করেন কোনো বিয়ে বা শ্রাদ্ধানুষ্ঠানে বিলিতি চিনি ও বস্ত্র ব্যবহৃত হলে তাঁরা পৌরোহিত্য করবেন না। নদিয়ার জনৈক চন্দ্রক ান্ত পাল জিদ করে বিদেশি চিনি ব্যবহার করায় তাঁর ধোপানাপিত বন্ধ করা হয়। কেষ্ট নাপিত গোপনে ও বাড়িতে ক্ষৌরকর্ম করায় তার নিকট আত্মীয়রা তাকে প্রকাশ্যে প্রহার করেন।

ভাটপাড়া ও নবদ্বীপের পণ্ডিতেরা কেবল যে সার্কুলার দিয়ে বিদেশি বয়কট সমর্থন করেছিলেন তা নয়; তারা কলকাতার প্রধান অনুষ্ঠানে প্রতিনিধিও পাঠিয়েছিলেন। কালীঘাটের ধোপারা সভা করে জানিয়েছিল, বাবুদের বিদেশি কাপড় তারা ক াচবে না। ময়মনসিং -- এর মুচিরা ঘোষনা করেছিল, বিদেশি জুতা তারা পালিশ করবে না। বিদেশি বর্জন প্রায় পাগলা মির পর্যায়ে পৌঁছেছিল। ইংরেজ ব্যবসায়ীদের ধোপা নেই, নাপিত নেই, বাবুর্চিরা বিদেশি নুনে রান্না করবে না। বিদেশি প্লেট মাজবে না বিদেশি জুতো পালিশ তো নয়ই, ছিঁড়লে দেশি মুচি তা' সারাবে না।

বিদেশি পণ্য বর্জনের আন্দোলন প্রচণ্ড আকার ধারণ করার পাশাপাশি ন্যাশনাল সোপ ফ্যাক্টরি, বঙ্গলক্ষী কটন মিল, বেঙ্গ ল ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক, যশোহর চিনি ফ্যাক্টরি ইত্যাদি ছোটোবড়ো বহু দেশিয় সংস্থা প্রতিষ্ঠিত হল। এইচ বোসের চুলের তেল -- 'কুন্তলীন' এবং সুগন্ধী 'দেলখোস' -- এই দুটি ব্র্যান্ড ছিল। আর একটি বড় কৃতিত্ব ফনোগ্রাফের সিলিনড্রিকাল রেকর্ড তৈরি করা। স্বদেশি আন্দোলনের ভাবধারা ছড়িয়ে দেওয়ার ক্ষেত্রে স্বদেশি গান বিশেষ ভূমিকা নিয়েছিল আর সেই স্ব দেশি গানকে ছড়িয়ে দেওয়ার ক্ষেত্রে বিরাট ভূমিকা পালন করেছিল এইচ বোস উদ্ভাবিত এই রেকর্ড।

এই সময়ই ১৯ জন (মতান্তরে ১৬ জন) বাঙালি যুবক বিদেশে, বিশেষ করে জাপান গিয়ে নানা শিল্প, প্রযুক্তিগত প ারদর্শিতা অর্জনের প্রশিক্ষণ লাভ করে আসেন। এক বছরে সকলকে নয় পরপর কয়েক বছর ধরে এদের বিদেশে পাঠানো হয়েছিল বৃত্তি প্রদান করে।

আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র রায় স্বদেশি আন্দোলনের আর একটা দিকের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন তা' হলো 'স্বদেশি মেলা' যেখানে স্বদেশি শিল্পদ্রব্য প্রদর্শিত হত। এই ধরনের স্বদেশি মেলা শু হয়েছিল ১৯০৬ সালে। ওই বছর ২১ ডিসেম্বর কলকাতায় অনুষ্ঠিত

হয়েছিল ভারতীয় শিল্প ও কৃষি প্রদর্শনী।

১৯০৫ সালে স্বদেশি আন্দোলন শু হলে বিদেশি পণ্য বয়কটের সঙ্গে সঙ্গে বিদেশি শিক্ষা বয়কটও শু হয়। সরকারি শিক্ষার বিকল্প হিসাবে স্বাভাবিকভাবেই জাতীয়তাবাদী নেতৃবৃন্দ আরোপ করলেন স্বদেশি জাতীয় শিক্ষার উপর, ১৯০৫ সালে ৯ নভেম্বর কলকাতায় পাস্তির মাঠে (বর্তমানে যেখানে বিদ্যাসাগর কলেজের ছাত্রাবাস অবস্থিত) এক জনসভায় ভগিনী নিবেদিতা একটি জাতীয় ঝিবিদ্যালয় স্থাপনের প্রস্তাব করেন। তাঁর আহ্বানে সাড়া দিয়ে সুবোধচন্দ্র মল্লিক জাতীয় ঝিবিদ্যালয় স্থাপনের জন্য এক লক্ষ টাকা দেবার প্রতিশ্রুতি দেন। তাঁর এই দানের জন্য কৃতজ্ঞ দেশবাসী তাঁকে 'রাজা, উপাধিতে ভূষিত করেন। পূর্ববঙ্গের ময়মনসিংহের জমিদার ব্রজেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী, মুক্তাগাছার মহারাজা সূর্যকান্ত আচার্য চৌধুরীও কয়েক লক্ষ টাকার সম্পত্তি জাতীয় ঝিবিদ্যলায় স্থাপনের জন্য দান করেন। অকাতরে অর্থদান করেন তারকনাথ পালিত ও রাসবিহারী ঘোষ। এই প্রস্তাব রূপায়নের জন্য সক্রিয় সহযোগিতা করতেএগিয়ে আসেন রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং, স্যার গুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ শিক্ষাবিদ। ১৯০৬ সালের ১১ নভেম্বর জাতীয় শিক্ষা পরিষদের প্রদীপ প্রজ্জ্বলন হয় প্রায় সকল চিন্তাবিদ শিক্ষাব্রতীদের সামনে।

স্থাপিত হল বেঙ্গল জাতীয় কলেজ এবং বিদ্যালয়। এই জাতীয় কলেজের প্রথম অধ্যক্ষ ছিলেন অরবিন্দ ঘোষ আর প্রথম তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন ডন সোসাইটির সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়। কারিগরি শিক্ষাদানের জন্য তারকনাথ পালিতের আগ্রহে ও প্রেরণায় স্থাপিতহল বেঙ্গল মেকানিক্যাল ইনস্টিটিউট। বিট্রিশ সরকারের নিয়ন্ত্রণের বাইরে একটা সমান্তরাল শিক্ষাদান পদ্ধতির উদ্ভব ঘটল জাতীয় শিক্ষা পরিষদের মাধ্যমে। এটাও স্বদেশি আন্দোলনের বৈশিষ্ট্য। এ কাজটাও বাংলাতেই প্রথম সার্থকভাবে করা হয়। ভারতের স্বাধীনতাসংগ্রামের সাফল্য লাভের জন্য এই প্রচেষ্টার আন্তরিকতা দেশবাসীর মনে আত্মবিশ্বাস সৃষ্টি করল।

বঙ্গভঙ্গের সিদ্ধান্ত প্রকাশিত হলে প্রাথমিকভাবে হিন্দুদের মতন মুসলমান সমাজের মধ্যেও বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়। অনেকেইপ্রথম কার্জন পরিকল্পনা মেনে নিতে পারেননি। এমন কি, মুনতাসীর মামুন সম্পাদিত ''বঙ্গভঙ্গ'' গ্রন্থে দেখানো হয়েছে যে পরবর্ত্তীকালে বঙ্গভঙ্গের দৃঢ় সমর্থক ঢাকার নবাব সলিমুল্লাহ নিজেই প্রাথমিক পর্যায়ে সরকারি পরিকল্পনার বিরোধী ছিলেন। মোসলেম ক্রনিকাল এই প্রস্তাবকে নিন্দা করে এবং কলকাতার সেন্ট্রাল ন্যাশনাল মোহামেডান অ্যাসোসিয়েশনের এক সভায় সামসুল হুদা এই বিভাজনের বিদ্ধে মত জ্ঞাপন করেন। কার্জন পরিকল্পনাকে বিরোধিতা করার উদ্দেশ্যে এসময় ঢাকা ও ঢাকার বাইরে জনমত গঠনে অনারারী ম্যাজিস্ট্রেট ও জমিদার খলিসুর রহমান আবু জাইগম সাবির, বালিয়াদির জমিদার কাজেমউদ্দিন আহমদ্ সিদ্দিকি, ইমামগঞ্জের মাষ্টার হেদায়েত বক্স প্রমুখ বিশিষ্ট বহু মুসলমান ব্যক্তিত্বই অংশ নেন। তবে তাঁদের অনেকের মধ্যেই বঙ্গভঙ্গ বিরোধিতার বিষয়টি আদর্শগত বারাজনৈতিক ছিল না। মূলত শিক্ষালাভে বা ব্যবসা - বাণিজ্যে (কলকাতা বন্দরের মাধ্যমে) অসুবিধার বিষয়টিই অনেকের মাথায় ছিল বলে মনে করেন ইমরান হোসেন ও এ.টি.এম আতিকুর রহমানের মত গবেষকগণ।

বহু মুসলমান নেতা এই স্বদেশি আন্দোলন সমর্থন করেন, যেমন আবদুল কাসেম, আবদুল রসুল, লিয়াকত হোসেন, আবদুল হালিম গজনভি, মওলানা আবু বকর, মৌলভি হেদায়েতউল্লাহ। জমিদার - ভূস্বামী নন এমন সাধারণ মুসলিম নেতৃবৃন্দের সংখ্যা আরো বেশি, যাঁরা বঙ্গভঙ্গ বিরোধী স্বদেশি আন্দোলনে যুক্ত ছিলেন। ১৯০৭ সালে ফরিদপুরের মুসলমানদের পক্ষ থেকে বাংলাকে পুনরায় একত্রিত করার দাবি পেশ করা হয়। এতে বেলগাছীর জামিদার আলিসুজ্জামন চৌধুরী, ফরিদপুরের আবদুর রহমান, খানপুরের জমিদার রহমতজান চৌধুরী স্বাক্ষর করেন। বিদেশি জিনিষ বর্জন করে স্বাবলম্বী হবার মানসে মুসলমানরা এই সময় হিন্দুদের সাথে যৌথ উদ্যোগে এবং একভাবে শিল্প প্রতিষ্ঠান ও ব্যবসায়ী কোম্পানী প্রতিষ্ঠা করেন। চট্টগ্রামের ব্যাবসায়ী ও জমিদারগণ ১৯০৫ সালে বেঙ্গল নেভিগেশন স্টিম নেভিগেশন কোম্পানী প্রতিষ্ঠা করেন। এক লক্ষ টাকা মূলধনের এই প্রতিষ্ঠানের ম্যানেজিং ডাইরেক্টর ছিলেন মুনসি কালা মিয়া। আব্দুল রসুল, অশ্বিনীকুমার ও অন্যান্যরা কো - অপারেটিভ নেভিগেশন কোম্পানি প্রতিষ্ঠা করেন। তা ছাড়া অব্দুল হালিম গজনভীর বেঙ্গল কোম্পানী, বেঙ্গল হোসিয়ারি কোম্পানি ছিল উল্লেখযোগ্য স্বদেশি প্রতিষ্ঠান।

স্বদেশি আন্দোলনে চিহিত প্রকাশ্য সভা সমাবেশের সংখ্যা প্রচুর। যোগেশচন্দ্র বাগলের হিসেব অনুযায়ী ১৯০৩ সালের ডিসেম্বর থেকে ১৯০৫ সালের অক্টোবর পর্য্যন্ত অভিভক্ত বাংলায় দু'হাজারেরও বেশি জনসভা অনুষ্ঠিত হয়েছিল। যাতে

উপস্থিত থাকতেন পাঁচশো থেকে পঞ্চাশ হাজার পর্যন্ত মানুষ। ২২ শে সেপ্টেম্বরের টাউন হল সভায় সুরেন্দ্রনাথ জা নিয়েছিলেন যে, শুধুমাত্র তার আগের পনেরো দিন বাংলা প্রদেশে ১৬৭টি জনসভা অনুষ্ঠিত হয়েছে; যেগুলিতে মোট স াড়ে ছ'লক্ষ মানুষ সমবেত হয়েছিলেন। স্বদেশি আন্দোলন ঝিমিয়ে গেছে বলে ভারতসচিব মর্লি পার্লামেন্টে মন্তব্য করার পর ১৯০৬ সালের ৩০ মার্চ কলকাতায় একদিনে ১৭ টি জনসভা হয়েছিল। সুরেন্দ্রনাথের 'বেঙ্গলী' ছাপিয়েছিল ৫৭ জন বক্তার নাম যাঁরা ভাষণ দিয়েছিলেন এইসব সভায়। ঠিক এরকমভাবে জনমতকে প্রভাবিত করার চেষ্টা এদেশে আগে কখনও হয়নি। সভা সমাবেশের দাপট বোঝা যায় যখন দেখি ১৯০৭ সালের ১১ মে ব্রিটিশ সরকার সভা সমাবেশ নিয়ন্ত্রণে পুরোদস্তুর একটি অর্ডিন্যান্স জারি করে।

।।চার ।।

মুসলমান সমাজ, বিশেষত শিক্ষিত ও উচচবর্গীয়, যাতে বঙ্গভঙ্গ বিরোধিতা থেকে সরে আসে তার ব্যবস্থা করার জন্য ক ার্জন পূর্ববঙ্গ সফরে যান ১৯০৪ -এর ফেব্রুয়ারি মাসে। কার্জন পরিচালিত ভারতে ব্রিটিশ শাসনের উদ্দেশ্যই ছিল "মুসলমানদের কাছে নিজেদের শাসনকে মুসলমান শাসনের সমতুল্য এবং গ্রহণযোগ্য রূপে উপস্থিত করা"। পূর্ববঙ্গ সফরের সময় ঢাকায় ১৯০৪ -এর ১৮ ফেব্রুয়ারি এক বক্তৃতায় কার্জন খোলাখুলি বলেছিলেন পূর্ববঙ্গের মুসলমানদের যে ঐক্য সাধিত হবে সেই ঐক্য তারা সুপ্রাচীনকালের মুসলমান সুবেদার ও রাজাদের পরে আর ভোগ করেনি।

১৯০৫ সালের ফেব্রুয়ারিতে বাংলা সরকারকে লিখিত একটি পত্রে ভারত সরকার এই মত ব্যক্ত করেন যে বঙ্গভঙ্গের যে পরিকল্পনা তাঁরা করেছেন তাতে কিছুদিনের মধ্যেই ঢাকা অর্জন করবে---

"the special character of a provincial capital where mohamadan interest would be strongly represented if not predominant".

মুসলিম মধ্যশ্রেণী ও উচচবর্গীয় অভিজাত শ্রেণীর সামনে কার্জন ও তার সহযোগী ফ্রেজার - পুলার প্রমুখ উজ্জ্বল ভবিষ্যতের স্বপ্নতুলে ধরতে সমর্থ হয়। শিক্ষিত মুসলমান সমাজের অধিকাংশই 'মুসলিম - প্রধান আদালত', 'মুসলিম প্রধ ান শিক্ষা - ব্যবস্থা'ও' মুসলিম প্রধান সরকারি চাকুরী' এবং মুসলিম নিয়ন্ত্রিত ভূখণ্ডের অলীক স্বপ্ন দেখাতে শু করে সাম্র াজ্যবাদী কূটকৌশলের অন্তর্নিহিত অসদুদ্দেশ্য উপলব্ধি না করেই। ঔপনিবেশিক শাসনে যে ধর্ম - বর্ণ-ভাষা নির্বিশেষে কে ানো প্রজাতির ভারতবাসীরই প্রকৃত প্রাধান্য ও নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা কার্যত অসম্ভব -- এই বোধ তখন অনেকেরই ছিল না।

ঔপনিবেশিক শাসন প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পরে বাংলার হিন্দু সম্প্রদায়ের একাংশ পাশ্চাত্য শিক্ষাকে গ্রহণ করে, ইংরেজি শেখে, ফলে পেশাগত ক্ষেত্রে অপেক্ষাকৃতভাবে অগ্রসর হতে পারে। অপরদিকে ইংরেজদের হাতে শাসন ক্ষমতা হারানে াকে মুসলমান সম্প্রদায় সহজে মেনে নিতে পারে নি। সরকারি ভাষা হিসেবে ১৮৩০-এর দশকে ফারসির স্থানে ইংরেজি হত শাসন ক্ষমতা হারানোকে মুসলমান সম্প্রদায় সহজে মেনে নিতে পারে নি। সরকারি ভাষা হিসেবে ১৮৩০ -এর দশকে ফারাসি স্থানে ইংরেজির আগমন তারা প্রথম গ্রহণ করতে পারেনি। পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রতি এই অনীহা উনিশ শতকের প্রথমভাগে বাঙালি মুসলমান সমাজকে পেশাগতভাবে অগ্রসর হতে দেয়নি। অর্থাৎ ঐ সময়ে বঙ্গদেশে মুসলমান সমাজে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর উদ্ভব হতে পারেনি যেটা ঘটেছিল বাঙালি হিন্দু সমাজে। ঐ সময়ে বাঙালি মুসলমান সম্প্রদায়ের বৃহত্তর অংশ কৃষিকার্যের সঙ্গে যুক্ত ছিল। জমিদাররা ছিলেন প্রধানত হিন্দু এবং অত্যাচারিত কৃষকদের একটি বৃহৎ অংশ ছিল মুসলমান।

১৮৫৭-৫৮ খ্রীষ্টাব্দের মহাবিদ্রোহ দমিত হবার পর উনবিংশ শতকের দ্বিতীয়ভাগ থেকে বাংলা তথা উত্তর ভারতের মুসলমান সম্প্রদায়ের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিগণ অনুধাবন করেন যে প্রতিরোধের মাধ্যমে নয়, হিন্দু সম্প্রদায়ের মতো ঔপনিবেশিক সরকারের সঙ্গে সহযোগিতার মাধ্যমে, ইংরাজি শিক্ষা গ্রহণের মাধ্যমে মুসলমান সম্প্রদায়কে অগ্রসর হতে হবে। সুতরাং উনিশ শতকের দ্বিতীয় ভাগকে বঙ্গদেশে মুসলমান মধ্যবিত্ত শ্রেণীর এই বিলম্বিত আবির্ভাব তাৎপর্যপূর্ণ ছিল। ঔপনিবেশিক শাসনে এমনিতেই পেশাগত সুযোগ সংকুচিত ছিল তার উপর এই বিলম্বিত আবির্ভাবের ফলে বাঙা লি মুসলমান মধ্যবিত্ত শ্রেণী লক্ষ্য করেছিল যে পেশার ক্ষেত্রে তুলনামূলকভাবে তারা পেছনে পড়ে আছে আর হিন্দুস ম্প্রদায়, বিশেষত শিক্ষিত উচচবর্গের হিন্দুরা, অপেক্ষাকৃতভাবে সুবিধাজনক অবস্থায় আছে। বাংলার সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমান সম্প্রদায়ের আপেক্ষিক অনগ্রসরতাকে সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থের কাজে লাগালেন কার্জন। সাম্প্রদায়িকতার বিষ

ছড়ানোই ছিল বঙ্গভঙ্গের প্রধান উদ্দেশ্য।

ঔপনিবেশিক সরকারের পক্ষ থেকে বঙ্গভঙ্গের পেছনে প্রশাসনিক সুবিধার কথা বলা হলেও সকলেই বুঝেছিল বঙ্গভঙ্গের সিদ্ধান্তশুধুমাত্র একটি প্রশাসনিক বা ভৌগোলিক বিভাগ মাত্র নয়; বাঙালি হিন্দু মুসলমানদের মধ্যে মানসিক বিভেদ ঘটানোই এর প্রধানতম উদ্দেশ্য --- প্রশাসনিক সুবিধার ওজর তোলা অজুহাত মাত্র। রবীন্দ্রনাথের সংবেদনশীল দার্শনিক চিত্তে তার ধাক্কা প্রথমেই এসেছিল বলে তাঁর প্রাথমিক প্রতিত্রিয়াও হয়েছিল দ্রুত এবং তীব্র। ১৯০৮ সালে লেখা 'সদুপায়' নিবন্ধই তার প্রমাণ। রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন ---

বাংলাদেশের পূর্বভাগে মুসলমানের সংখ্যাই অধিক। ধর্মগত ও সমাজগত কারণে মুসলমানের মধ্যে হিন্দুর চেয়ে ঐক্য বেশী, সুতরাং শক্তির প্রধান উপকরণ তাদের মধ্যে নিহিত হইয়া আছে। এই মুসলমান অংশ ভাষা সাহিত্য শিক্ষা প্রভৃতির একত্ববশত হিন্দুদের সঙ্গে অনেকগুলি বন্ধনে বদ্ধ আছে। যদি বাংলাকে হিন্দু - প্রধান ও মুসলমান - প্রধান এই দুই অংশে একবার ভাগ করা যায় তবে ত্রমে ত্রমে হিন্দু মুসলমানের সকল বন্ধনই শিথিল করিয়া দেওয়া সহজ হয়।

"ম্যাপে দাগ টানিয়া হিন্দুর সঙ্গে হিন্দুকে পৃথক করিয়া দেওয়া কঠিন। কারণ, বাঙালি হিন্দুর মধ্যে সামাজিক ঐক্য আছে। কিন্তু মুসলমান ও হিন্দুর মাঝখানে একটা ভেদ রহিযা আছে। সেই ভেদটা যে কতখানি তাই উভয়ে পরস্পর কাছাকাছি আছে বলিয়াই প্রত্যক্ষভাবে অনুভব করা যায় নাই, দুইপক্ষে একরকম করিয়া মিলিয়া ছিলাম।

"কিন্তু যে ভেদটা আছে রাজা যদি চেষ্টা করিয়া সেই ভেদটাকে বড়ো করিতে চান এবং দুই পক্ষকে যথাসম্ভব স্বতন্ত্র করিয়া তোলেন তবে কালত্রমে হিন্দু - মুসলানের দূরত্ব এবং পরস্পরের মধ্যে ঈর্ষা - বিদ্বেষের তীব্রতা বাড়িয়া চলিবে তাহাতে সন্দেহ নাই।"

(আত্মশক্তি ও সমূহ ঃ সদুপায়, রবীন্দ্র রচনাবলী, জন্মশতবার্ষিকী সংস্করণ, দ্বাদশ খণ্ড, ১৯৬১ পৃঃ ৮২৭)

শুধু সচেতন হিন্দু নেতৃত্ব নয়, সচেতন মুসলমান নেতৃত্বও বুঝতে পেরেছিলেন বঙ্গবিচ্ছেদের প্রকৃত উদ্দেশ্য কি এবং দেশপ্রেমিক বাঙালি মাত্রেরই কি করণীয়। ১৯৫৬ -এর এপ্রিল মাসে (১৪-১৫) বরিশালে বঙ্গীয় প্রাদেশিক সভার সভাপতিরূপে আবদুল রসুল -এর কথাগুলি তো চিরস্মরণীয় --

ভারতে ইংরেজ শাসনের মূল নীতি এই যে ভারতের দুইটি সম্প্রদায় হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে ভেদ সৃষ্টি করা। এবং উহা বলবৎ রাখা। ফলে উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে বিবাদ বিসম্বাদ চলিতে থাকিবে। কৃষক যেমন তাহার শস্যক্ষেত্রে বড়ো বড়ো ঢেলাগুলি একটাকে দিয়া আর একটাকে ভাঙিয়া গুড়া করিযা লয়, ইংরেজ সরকার তেমনি হিন্দুর বিদ্ধে মুসলমানকে এবং মুসলমানের বিদ্ধে হিন্দুকে দিয়া শত্রুতা সৃষ্টি করিয়া উভয় সম্প্রদায়ের অনিষ্ট সাধন করিতেছে। ইহাই ভারতে তাহাদের রাজনীতি ও শাসননীতি। ইংরেজ সরকার বেশ জানে যে হিন্দু ও মুসলমান, এই দুই সম্প্রদায় নিলিত হইয়া খিয়া দাঁড়াইলে ইংরেজদের এ দেশে শাসন করা তো দূরের কথা, ভারতে একদিন তিষ্টিবারও সাধ্য থাকিবে না।

খুবই খাঁটি কথা। কিন্তু এ কথাও ঠিক যে সারাজীবন, শত শত বৎসর পাশাপাশি থেকেও হিন্দু মুসলমানের পরস্পরের সম্পর্ক স্বাভাবিক হতে পারেনি। সম্পর্কের মধ্যে লক্ষণীয় ফাঁক ও ফাঁকি ছিল বলেই ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীরা যখন প্রমাদ গণনা করেছে, তখনই দু'পক্ষের ক্ষমতালোভী ও ধর্মান্ধদের ব্যবহার করে সাম্প্রদায়িক বিচ্ছেদ ও দাঙ্গা হাঙ্গামা সৃষ্টি করার সুযোগ নিতে পেরেছে।

বঙ্গভঙ্গ - বিরোধী আন্দোলনের সময়ে সাধারণ মুসলিম জনতাকে উত্তেজিত করে তোলার জন্য মৌলবাদীরা সবরকম গুজব ও সাম্প্রদায়িক প্রচারের ব্যবহার করেছিল। গুজব ছড়ানো হয়েছিল যে ইংরেজরা নাকি সব ক্ষমতা ঢাকার নবাব সলিমুল্লহকে হস্তান্তর করবে। 'লাল ইস্তাহার' নামক সাম্প্রদায়িক প্রচার - পুস্তকটি এক্ষেত্রে হিন্দু - বিদ্বেষ প্রচারে ভয়ানকভাবে ব্যবহৃত হয়েছিল। 'মিহির ও সুধাকর' পত্রিকার কর্মকর্তা নবাব নওয়ার অলিচৌধুরীও যথেষ্ট সাম্প্রদায়িক প্রচার করেন। ঢাকার নবাব সলিমুল্লাহ -র মতন প্রবল উচচাকাঙ্খী নেতাদের কার্জন এক লক্ষ টাকা নাম মাত্র সুদে ঋণ (আসলে অনুদান) প্রদান করেন। সন্দেহ যে মুসলিমদের মধ্যে হিন্দু সম্প্রদায়ের প্রতি ঘৃণা ও বিদ্ধতা জাগানোর জন্যই এই অর্থের সিংহভাগ কাজে লাগানো হয়।

বঙ্গভঙ্গ কার্যকর হবার অব্যবহিত পূর্বেও যে 'সেন্ট্রাল ন্যাশনাল মোহামেডান অ্যাসোসিয়েশনের' মতো সংগঠন বা 'মুসলিম ত্রনিকলের'র মত সংবাদপত্র কার্জন -- পরিকল্পনার বিদ্ধে ছিল, বঙ্গভঙ্গ কার্যকর হয়ে যাওয়ার পরেই তারা সরক

ারি নীতির প্রচণ্ডতম সমর্থক হয়ে উঠলো। দুটি পত্রিকা 'ইসলামের প্রচারক' এবং 'মিহির ও সুধাকর' -- এর মাধ্যমে মুসলিম শিক্ষক সম্প্রদায় বয়কট ও স্বদেশিআন্দোলনের বিরোধিতা করেছিল। কুমিল্লার একজন ভূস্বামী ফয়েজ্জুন্নেসা চৌধুরী ছিলেন 'ইসলাম প্রচারক' -- এর প্রধান পৃষ্ঠপোষক।'মিহির ও সুধাকর' আর্থিক সাহায্য পেত সহিবমুল্লাহ ও নবাব আলি চৌধুরীর কাছ থেকে। উত্তর ভারতের অবাঙালি মুসলমানও বঙ্গভঙ্গ সমর্থন করেছিল। আলিগড় ইনস্টিটিউট গেজেট লিখেছিল ঃ The Partition of Bengal will prove a God sent to the Muselman residents of the Province, who will now find a splendid opportunity for making rapid progress both in their education and social Position." বঙ্গভঙ্গকে এভাবে মুসলমান সমাজের অধিকাংশই নিজ সম্প্রদায়ের উন্নতি ও সুবিধালাভের পন্থা বলে মনে করেছিলেন।

স্বদেশি আন্দোলন যখন উত্তেজনার শিখরচূড়ায় তখন ময়মনসিং জেলার ঈশ্বরগঞ্জে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাহাঙ্গামা শু হয় ১৯০৬ সালের মে মাসে। পরের বৎসর কুমিল্লা, জামালপুর, দেওয়ানগঞ্জ, বাখরগঞ্জ ও ময়মনসিং জেলার দাঙ্গাহাঙ্গামা ছড়িয়ে পড়ে। ব্রিটিশ গবেষক জন আর ম্যাকলীন এই সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা ও মুসলিমদের সহিংস মনোভাবের জন্য সরকারকেই দায়ী করেছেন। তাঁর বক্তব্য হোল " যে সমস্ত ঘটনাবলী ১৯০৯ সালের হিন্দু - মুসলিম দাঙ্গা সৃষ্টি করেছিল এবং মুসলিমদের স্বাতন্ত্রকে সংবিধানগত স্বীকৃতি প্রদানের দাবির জন্ম দিয়েছিল, সে ঘটনাবলীতে ব্রিটিশ ভূমিকাই ছিল মুখ্য। ১৯০৫-০৯ কালপর্বে বহুক্ষেত্রেই সরকারী নীতির মূল সুর নিরপেক্ষ ছিল না। বরং সরকারী কর্মকর্তাগণ বঙ্গভঙ্গের ফলে সৃষ্ট সাম্প্রদায়িক আগুনকে আরো উসকে দিয়েছিলেন।"

গোঁড়া মুসলিমদের সাম্প্রদায়িক প্রচার এবং ইংরেজ সরকারের জাতীয় সংহতিনাশকারক এই প্রচেষ্টা এত দ্রুত কার্যকরী হতো নাযদি না বয়কট আন্দোলন যে চরিত্র নিল তা' না নিত যার জন্য রবীন্দ্রনাথ কাউকে কিছু না বলে নিজেকে এই অ ান্দোলন থেকে সরিয়েনিলেন। বঙ্গভঙ্গ বিরোধী স্বদেশি আন্দোলনে অংশগ্রহণ প্রসঙ্গে মুসলিম নেতৃত্ব ও জনসাধারণকে নয়, হিন্দু নেতাদেরই দায়ী করেছেন রবীন্দ্রনাথ---

বঙ্গ বিচ্ছেদ ব্যাপারটা আমাদের অন্নবস্ত্রে হাত দেয় নাই, আমাদের হৃদয়ে আঘাত করিয়াছিল। সেই হৃদয়টা যত দূর পর্যন্ত অখণ্ড, তত দূর পর্যন্ত তাহার বেদনা অপরিচ্ছিন্ন ছিল। বাংলা মুসলমান যে এই বেদনায় আমাদের সঙ্গে এক হয় ন াই তাহার কারণ, তাহাদের সঙ্গে আমরা কোনদিন হৃদয়কে এক হইতে দিই নাই।

সংস্কৃত ভাষায় একটা কথা আছে, ঘরে যখন আগুন লাগিয়েছে তখন কূপ খুঁড়িতে যাওয়ার আয়োজন বৃথা। বঙ্গ - বিচ্ছেদের দিনেহঠাৎ যখন মুসলমানকে আমাদের দলে টানিবার প্রয়োজন হইল তখন আমরা সেই কূপ খননেরও চেষ্টা করি নাই -- আমরা মনে করিয়াছিলাম, মাটির উপরে ঘটি ঠুকিলেই জল আপনি উঠিবে। জল যখন উঠিল না, কেবল ধুলাই উড়িল, তখন আমাদের বিস্ময়ের সীমাপরিসীমা রহিল না। আজ পর্যন্ত সেই কূপ খননের কথা ভুলিয়া আছি। অ ারো বার বার মাটিতে ঘটি ঠুকিতে হইবে, সেই সঙ্গে সে ঘটি আপনার কপালে ঠুকিবে।

(লোকহিত ঃ কালান্তর, রবীন্দ্র রচনাবলী, জন্মশতবার্ষিক সংস্করণ, ত্রয়োদশ খণ্ড, ১৯৬১, পৃষ্ঠা ২২৪)

তবে কোথায়ও এর ব্যতিত্রম ছিল না তা ঠিক নয়। বরিশালে অশ্বিনী দত্তের নেতৃত্বে স্বদেশি আন্দোলন ছিল হিন্দু মুসলম ানের মিলিত আন্দোলন। এমন কি ঢাকার নবাব ও মুসলমান জনগণকে এখানে স্বদেশি আন্দোলন বিরোধী করতে পারেন নি -- ঢাকার নবাবের হুকুম বরিশালের একটি হাটে বিলাতি লবণ ও বিলাতি কাপড়ের দোকান বসানো হয়। অশ্বিনী দত্তের হুকুমে তখন নদীর অপর পাড়ে নতুন হাট বসানো হলো। পুরানো হাট বিলাতি সংস্পর্শী হাওয়ায় একেবারে পরিত্যক্ত হলে া। সে অঞ্চলের অধিবাসীর প্রায় সকলেই ছিলেন মুসলমান।

।।পাঁচ।।

স্বদেশি আন্দোলনে ত্রমে কালোছায়া ফেলল হিন্দু - মুসলমান বিরোধের নানা ঘটনা। ব্রিটিশ শাসকরাও অনেক স্থূল ও সূক্ষ্ম উপায়ে বিভেদ ঘটানোর চেষ্টা চালাল। ব্রিটিশের দমননীতি যত উগ্র হলো, আন্দোলনের মেজাজও তত জঙ্গি হয়ে উঠল। মাথাচাড়া দিল বিপ্লবী সন্ত্রাসবাদ। এই সময় ভারতের বড়লাট হয়ে এলেন হার্ডিঞ্জ ১৯১০ -এর ১০ নভেম্বর।

তাঁর আসবার পর থেকেই ভারতের রাজনৈতিক পটভূমিতে এক অন্য হাওয়া বইতে শু করে। তিনি বুঝতে পারলেন যে ব াঙালিহিন্দুদের অভিযোগ যথার্থ। ১৯১১-এর ১৩ জুলাই হার্ডিঞ্জ ব্রুকে এক পত্রে যে আশায় বঙ্গভঙ্গ করা হয়েছে তা' যে

সফল হয়নি তার ইঙ্গিত দেন। 'বাংলার রাজনৈতিক সংস্কৃতি ক্ষুণ্ণ করা যায় নি। তাছাড়া বাঙালির রক্তে রয়েছে বিক্ষোভ প্রকাশের উন্মাদনা এবং যতদিন না বঙ্গভঙ্গের কিছু পরিবর্তন বা পরিমার্জন হচ্ছে ততদিন তারা আন্দোলন থেকে বিরত হবে না।' সেই জন্য তিনি তিনটি পন্থা অবলম্বন করলেন -- বাঙালি হিন্দুদের সন্তুষ্ট করা, মুসলমানদের পক্ষে আনা এবং কার্যকর প্রশাসনিক ইউনিট গঠন করা। হার্ডিঞ্জের কাছে রাজধানী সরানোটাই তার পরিকল্পনার মূল লক্ষ্য ছিল।
১৯১১ সালের ১২ ডিসেম্বর দিল্লি দরবারে বঙ্গভঙ্গ রদ ঘোষণা করেন পঞ্চম জর্জ। দুই বাংলা এক হল। বাংলা থেকে আলাদা হয়ে গেলেন বিহার, ওড়িষা এবং ছোটনাগপুর। কলকাতা থেকে দিল্লিতে রাজধানী স্থানান্তরিত হল।
বাংলা ভাগ না করে বিহার ও ওড়িষাকে বাংলা প্রেসিডেন্সি থেকে বিভেদ করার কথা আগেই কিছু নেতারা বলেছিলেন, কিন্তু কার্জন তখন সেটা শোনেন নি। এখন সেই প্রস্তাবই গ্রহণ করা হল সামান্য অদল বদল করে। কার্জন যদি ১৯০৫ সালের আগে সেটা করতেন তা' হলে আর বঙ্গ-বিভাজন বন্ধ করার জন্য আন্দোলনও হত না এবং ছয় বৎসর পরে তা' রদেরও প্রয়োজন হত না।
হার্ডিঞ্জ দুই বাংলাকে এক করলেন বটে আবার সেই সঙ্গে বাংলার যে রাজনৈতিক কর্তৃত্ব ছিল ভারতের রাজধানী কালকাতায় থাকার জন্য তারও বিনাশ করলেন। বাংলা হারাল ভারতের রাজনীতিতে তার মর্যাদা -- যার আর কখনও পুনদ্ধার করা সম্ভব হয়নি।
স্বদেশি আন্দোলনের উদ্দেশ্য ছিল বঙ্গভঙ্গ রদ, স্বাধীনতা লাভ নয়। আন্দোলনকারীদের হাতিয়ার ও অধিকাংশ ক্ষেত্রে খুব কিছু ধারালো ছিল না। বিদেশি দ্রব্য বর্জন ও স্বদেশি দ্রব্যের ব্যবহার তারা ব্রিটিশকে শুধু খানিকটা অর্থনৈতিক অসুবিধায় ফেলতে পেরেছিল।কিন্তু আমাদের স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাস এই আন্দোলনের সব থেকে বড়ো অবদান ও সাফল্যের পরিচয় থেকে গেল বাঙালি তথা ভারতীয় মানসে প্রথম স্বাধীনতা কামনার উদয়ে। ১৯১১ সালে ব্রিটিশ বঙ্গভঙ্গ রদের দাবি মেনে নেওয়ার থেকেও আন্দোলনের এই ফলটা অনেক বেশি গুত্বপূর্ণ। ব্রিটিশ রাজ প্রবল শক্তিশালী ও অপরাজেয়। এই অতিকথাও চূর্ণ হল। ব্রিটিশ যে ভারতের স্বাধীনতা অপহরণ করেছে, ব্রিটিশ শাসন যে কোনমতেই সুশাসন নয় কিছুতেই কাম্য নয়, এটা স্পষ্ট বোঝা গেল। পরাধীনতার জ্বালা অনুভূত হলো তীব্রভাবে, স্বাধীনতার আকাঙ্খা জাগল, স্বাধীনতা হীনতায় কে বাঁচিতে চায়!

।।ছয় ।।
১৯০৫ -এর বঙ্গভঙ্গের বিদ্ধে বিশেষভাবে সোচচার হয়েছিলেন প্রধানত হিন্দু জাতীয়তাবাদীদের অর্থাৎ হিন্দু শিক্ষিত উচচবর্ণের মানুষ। আর মজার ব্যাপার হল এই যে ১৯৪৭ সালে আবার যখন বঙ্গভঙ্গ হল তখনও সেই বঙ্গভঙ্গের পক্ষে ছিলেন সেই হিন্দু উচচবর্ণের শিক্ষিত মানুষেরই এক বড় অংশ।
১৯৪৭ -একটা প্রস্তাব ছিল অভিভক্ত বাংলা রাখার পক্ষে, যে প্রস্তাবের স্বপক্ষে যাঁরা ছিলেন তাঁদের অন্যতম হলেন শরৎচন্দ্র বসু এবং বিপক্ষে যাঁরা ছিলেন তাঁদের অন্যতম প্রধান হলেন শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়। অধিকাংশ মধ্যবিত্ত হিন্দুই সেদিন শ্যামাপ্রসাদের যে পথ সেই পথটাই বেছে নিয়েছিলেন।
কি এমন হয়ে গেল এই ৪২ বছরের মধ্যে যে, উচচ এবং মধ্যবিত্ত বাঙালি যাঁরা বঙ্গভঙ্গের বিদ্ধে ১৯০৫ এর এমন সফল আন্দোলন গড়ে তুলেছিলেন তাঁরাই ১৯৪৭ -এ সম্পূর্ণভাবে উল্টো পথে হেঁটে বঙ্গভঙ্গের প্রস্তাবের পক্ষে হয়ে গেলেন।
বিশ শতকের প্রথম দশক থেকেই হিন্দু ও মুসলমান সম্প্রদায় গতভাবে একে অন্যের থেকে ত্রমশ দূরে সরে যেতে আরম্ভ করল। দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে বিভেদটা বাড়তেই লাগল। সেটা ব্রিটিশ শাসকরা করল তাদের বিভিন্ন নীতির মাধ্যমে --- (১) শাসন সংস্কারের নামে সাম্প্রদায়িক স্বতন্ত্র নির্বাচকমণ্ডলী গঠন, (২) সরকারি চাকুরীতে সম্প্রদায় - ভিত্তিক সংরক্ষণ, (৩) রাজনীতির সম্প্রদায়িকতাকরণ (৪) আদমশুমারির ব্যবহার এবং (৫) সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাহাঙ্গামা।
লর্ড কার্জনের স্থলাভিষিক্ত হয়ে এলেন লর্ড মিন্টো। তিনি ভারতীয় সমাজে প্রথাগতভাবে সাম্প্রদায়িকতার আমদানি করলেন এবং হিন্দু - মুসলমান সম্পর্ক যাতে উত্তরোত্তর খারাপ হয় তার ব্যবস্থা করলেন। তিনি তাঁর প্রাইভেট সেক্রেটারী মারফৎ আলিগড় মুসলিমকলেজের অধ্যক্ষের কাছে খবর পাঠালেন যে তিনি মুসলমানদের এক প্রতিনিধিদলের সঙ্গে দেখা করতে আগ্রহী। সেই অনুযায়ী মাননীয় আগা যাঁর নেতৃত্বে এক সর্বভারতীয় মুসলিম প্রতিনিধিদল দেখা করলেন তাঁর

সঙ্গে ১৯০৬ -এর ১ অক্টোবর সিমলায়। এই প্রতিনিধিদল দাবী করল যে মুসলমানদের যে এক স্বতন্ত্র নির্বাচকমণ্ডলী দেওয়া হয়, মুসলমানরাই ঠিক করবে কে তাদের প্রতিনিধি হবে এবং এই প্রতিনিধিদের সংখ্যাও হবে মুসলমানদের জনসংখ্যার অনুপাতের চেয়ে বেশি। এছাড়াও সরকারি চাকরিতে তাদের যেন দেওয়া হয় কিছু ভাগ। মিন্টো সব দাবীই শুধু মেনে নিলেন তা নয়, তাঁরা যা চাননি তাও তাদের দিলেন। এই প্রতিনিধিদল চেয়েছিলেন শুধু ইমপিরিয়াল ব্যবস্থাপক সভায় নির্বাচনের জন্য স্বতন্ত্র নির্বাচকমণ্ডলী। কিন্তু মিন্টো একধাপ এগিয়ে গিয়ে বসলেন যে সব প্রতিনিধিমূলক সংস্থায় -- যেমন পৌরসভা, ইউনিয়ন বোর্ড, ব্যবস্থাপক সভা সবেতেই মুসলমানদের জন্য আসন সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা হবে। মিন্টো যে আশ্বাস দিয়েছিলেন দিয়েছিলেন সেটা ১৯০৯ সাংবিধানিক আইনে --- যা মিন্টো - মর্লে সংস্কার নামেও পরিচিত -- বিধিবদ্ধ হয়। এই আইনে মুসলমানদের জন্য স্বতন্ত্র সাম্প্রদায়িক নির্বাচকমণ্ডলী, জনসংখ্যার নিরিখে যা প্রাপ্য তার চেয়েও বেশি সংখ্যকআসন এবং মুসলমানরা নিজেদের প্রতিনিধি নিজেরাই নির্বাচন করতে পারে স্বতন্ত্র নির্বাচকমণ্ডলীর মাধ্যমে তা' ব্যবস্থা করা হল। সেইথেকেই এই ব্যবস্থা ভারতীয় রাজনৈতিক কাঠামোর একটা অঙ্গই হয়ে গেল। ১৯১৬ সালে লক্ষ্মৌ অধিবেশনে জাতীয় কংগ্রেস এই ব্যবস্থা মেনে নিল। ১৯১৯ সালের সাংবিধানিক আইন যা মন্ট - ফোর্ন সংস্কার নামে প্রখ্যাত এবং পরে ১৯৩৫ - এর আইন --- যেটা তৈরি হয় ১৯৩০-৩২ এর গোল টেবিল বৈঠকের পর -- সবেতেই এই ব্যবস্থা বলবৎ থাকে। সাম্প্রদায়িক রাজনীতি সাংবিধানিক স্বীকৃতি লাভকরায় পুরো দেশটাই সাম্প্রদায়িক শক্তি সম্পূর্ণরূপে গ্রাস করে নিল -- যার ফলশ্রুতি ৪০ বৎসরের মধ্যে আবার ভারত বিভাগ, শুধু বঙ্গ - বিচ্ছেদ নয়, ধর্মের নামে এবং চিরকালের জন্য। জন্ম হল অন্য এক স্বাধীন দেশের।

১৯০৬ সালেই আর একটি ঘটনা ঘটলো যার সুদূরপ্রসারী প্রভাব ভারতের রাজনীতিতে এখনও অনুভূত হয়। মিন্টোর সঙ্গে সর্বভারতীয় প্রতিনিধিদল দেখা করলে অক্টোবর ১ তারিখে এবং তার তিন মাসের মাথায় ডিসেম্বর ৩০ তারিখে ব্রিটিশ শাসকদের পরামর্শে মুসলিম স্বার্থ রক্ষা করার জন্য গঠিত হল মুসলিম লিগ। ভারতে প্রথম সম্প্রদায় - ভিত্তিক রাজনৈতিক দলের অভ্যুদয় হল। তৈরি হল হিন্দু মহাসভা ১৯১৫ সালে মুসলিম লিগ জন্মের নয় বৎসর পর। এই দুই দলেরই বিশিষ্ট অবদান আছে সাম্প্রদায়িক বিভেদ ত্বরান্বিত করার ক্ষেত্রে। যদিও ১৯৪৭ -এর পর হিন্দু মহাসভা একটি সাইন বোর্ড সর্বস্ব দলে পরিণত হয়েছে। কিন্তু মুসলিম লিগ এখনও এক বিশিষ্ট রাজনৈতিক শক্তি দক্ষিণ ভারতে, বিশেষত কেরালাতে যেখানে মুসলিম লিগের আনুকূল্য ছাড়া কোন মন্ত্রিসভাই গঠিত হয় না।

১৯২২-২৭ এই পাঁচ বছরে ভারতের অনেক জায়গাতেই হিন্দু মুসলিম দাঙ্গা ঘটে যায়। ১৯০৯ এবং ১৯১৯ সালের আইন অনুযায়ী সংস্কারের নামে ভারতের রাজনীতিতে যে সাম্প্রদায়িক নির্বাচক মণ্ডলীর আমদানী করা হয় সেটাও বহুলাংশে এই দাঙ্গার জন্য দায়ীবলে মনে করা হয়। Muddiman Committee-এর প্রতিবেদন একটা খুবই পরিষ্কার হয়ে যায় এই কমিটি বলে যে, "আমাদের কাছে সাক্ষ্যপ্রমাণ দিয়ে এই মত ব্যক্তকরা হয়েছে যে এই সব সংঘাতের উদগাতা হচ্ছে এই সংস্কার নীতি। সবকিছু খতিয়ে দেখে মনে হচ্ছে সেই মত মোটেই ভিত্তিহীন নয়।বিভিন্ন সম্প্রদায়ের নিজ নিজ অবস্থা আরও সুদৃঢ় করার ইচ্ছাও এর একটা অন্তর্নিহিত ও গূঢ় কারণ হতে পারে।"

এই দাঙ্গা - হাঙ্গামার রাজনীতি চলল কয়েক বছর ধরে। সবচেয়ে রক্তক্ষয়ী দাঙ্গা বাধল কলকাতায় (গ্রেট ক্যালকাটা কিলিং) আরনোয়াখালিতে ভারতভাগের ঠিক আগে।

সম্প্রদায়গতভাবে সরকারী চাকুরিতে সংরক্ষণ উনিশ শতকের শেষ দিক থেকেই শু হয়ে যায়। যেমন ইউ. পি তে উনিশ শতকের শেষ দশকে সরকারী চাকরিতে সংররক্ষণ ছিল হিন্দুরা ৫ জন হলে মুসলমানরা হবে ৩ জন এই হিসাবে। পাঞ্জাবে আবার সংরক্ষণ ছিল সম্প্রদায়গতভাবে এবং জাত-অনুযায়ী। এবারে এ নিয়মটা দেশের অন্যন্য জাযগাতেও প্রবর্তন হল। সরকারি চাকরি পাওয়াটা হিন্দু- মুসলমানদের মধ্যে বিশেষত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর কাছে ছিল একটা আবেগের ব্যাপার। তাই চাকরি সংরক্ষণ ব্যাপারটা 'বিভেদ ও শাসন'এই নীতি পালনে খুবই একটা গুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিল এবং হিন্দু মুসলমানদের মধ্যে সংঘাতকে আরও বড় করতে সাহায্য করেছিল। সংরক্ষণ নীতির প্রভাব সম্বন্ধে বলতে গিয়ে ঐতিহাসিক বিপন চন্দ্র মন্তব্য করেন যে যখন ১৯৩০ সালে দেখা গেল যে সবকারীচাকরীতে সংররক্ষণ করে মুসলমান জনসাধারণের প্রায় কোন উপকারই হয়নি তখন সংরক্ষণ নীতি পুরো বাতিল বা তা' পর্যালোচনা নাকরে বলা হল যে হিন্দুদের আধিপত্য এতটাই যে এমনকি সংরক্ষণ নীতিও অসফল হল এবং এইজন্য আরও কড়া ওষুধ- মুসলমানদের জন্য আলাদা র

াজ্য গঠনই একমাত্র উপায়।

ব্রিটিশ শাসকদের ভেদনীতি কার্যকর করবার ক্ষেত্রে আদামশুমারির একটা প্রচণ্ড ভূমিকা আছে। ১৮৭১ সালে লর্ড মেয়ো যখন প্রথম আদামশুমারির প্রবর্তন করলেন তখন তিনিও বোধহয় ধারণাই করতে পারেন নি যে কালের গতিতে আদমশুমা রিকেও একটা চমৎকার অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করবে তারই উত্তরসূরীরা 'বিভেদ ও শাসন'অ নীতি রূপায়ণে। ভারতে সব প্রদেশেই মুসলমান সম্প্রদায় বাস করতেন করেন এবং করবেন। তবে কিছু জায়গায় তাদের সংখ্যাধিক্য। হিন্দু ও মুসলম ানের ভৌগোলিক ভেদরেখা মোটামুটি সুপ্রতিষ্ঠিত। এই বিভেদটাকেই ব্রিটিশ শাসকরা ব্যবহার করল শাসন ব্যবস্থায়। কে ান কোন ভৌগোলিক অঞ্চলে মুসলমানেরা সংখ্যালঘিষ্ঠ এবং কোন কোন অঞ্চলে তারা সংখ্যাগরিষ্ঠ তা' জানতে পারা য ায় আদমশুমারিতে। যেখানে মুসলমানরা সংখ্যাগরিষ্ঠ সেখানকার জন্য এ এক রকম নীতি এবং যেখানে তারা সংখ্যালঘিষ্ঠ সেখানকার জন্য অন্য নীতি। আর যেহেতু গণতন্ত্র এবং বিশেষ করে ব্রিটিশদের সংস্কার নীতি ও সরকারি চাকরিতে সংরক্ষণ নীতিতে জনসংখ্যার একটা বিশেষ ভূমিকা আছে তাই হিন্দু মুসলমান দুই সম্প্রদায়ের কাছেই আদম শুমারির গণনাকে একটু সন্দেহের চোখেই দেখা হত। ভারতভাগের সময় ১৯৪১ সালের আদমশুমারি যে সঠিক ছিল না সেইসম্ বন্ধেঅনেক অভিযোগও শোনা যায়।

বৃটিশ শাসকরা শাসন সংস্কার করেছিল ঠিকই কিন্তু তার মুখ্য উদ্দেশ্যই ছিল ভারতীয় বিধিবদ্ধ সমাজকে খণ্ড বিখণ্ড করে দেওয়া। তাদের এই নীতি ভারতীয় জাতীয়তাবাদের মূলে কুঠারাঘাত করল। যদিও ব্রিটিশ শাসকরা বঙ্গভঙ্গ সময় থেকে যে সব নীতি গ্রহণ করেছিল তার লক্ষ্য ছিল মূখ্যতঃ মুসলমান সম্প্রদায়, তবে তার আওতা থেকে বাদ যায়নি অন্যান্য ধর্ম সম্প্রদায়গুলি। সমস্ত ধর্ম সম্প্রাদায় যথা শিখ, খ্রীষ্টান জনগোষ্ঠি সেই পরিকল্পনায় স্থান পেয়েছিল। নিজ নিজ সম্প্রদায়ের স্বার্থরক্ষার তাগিদে জন্ম নিল আরও সম্প্রদায় - ভিত্তিক রাজনৈতিক দল। যেমন আকালি দলের উৎপত্তি হল শিখ স ম্প্রদায়ের স্বার্থ দেখবার জন্য ১৯২০-এর শেষদিকে। ব্রিটিশপ্রবর্তিত শাসন সংস্কারে ধর্মীয় সম্প্রদায়গুলি পেল বিশেষ মর্যাদা।

ব্রিটিশ শাসকবর্গ যখন দেখল যে তাদের বিভিন্ন পদক্ষেপ ধর্মীয় বিভাজন রেখাকে আরও বাড়িয়ে দিতে সফল হয়েছে, তখন তাদের নজর পড়ল জাতের (Caste) দিকে। হিন্দু রাজারা ছিলেন জাত - ব্যবস্থার ধারক ও বাহক। তাঁরাই ঠিক করতেন কোন জাতের সামাজিক মর্যাদা কি হবে। কোনটা হবে উচচশ্রেণীভুক্ত। তবে এ ব্যবস্থাটা ছিল সাময়িক। অর্থাৎ র াজারা ইচ্ছে করলেই নিম্নশ্রেণীভুক্ত জাতকে যে কোন সময় উচচশ্রেণীভুক্ত করতে পারতেন এবং উচছশ্রেণীভুক্ত জাতকে করতে পারতেন পতিত। ব্রিটিশ রাজও হিন্দুরাজাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে ঠিক করল তারা তৈরি করল এক নতুন জ াতের -- যাদের বলা হয় তপশিলী জাতি বা দলিত। তাদের জন্য ধর্মীয় সম্প্রদায়দের মতনই ব্যবস্থাপক সভায় সরকারি চ াকরিতে, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সংরক্ষণের ব্যবস্থা রাখা হল। জাত ও ধর্মভিত্তিক বিভাজনছাড়াও ব্রিটিশ শাসকরা লিঙ্গ - ভিত্তিক (পুষ ও নারী), বৃত্তি বা পেশা ভিত্তিক, (জমির মালিক, শিল্পপতি ইত্যাদি) অঞ্চল ভিত্তিক (যেমন মারাঠা), উপজা তি ইত্যাদি যত ভাগে ভাগ করা যায় ততভাবে বিভক্ত করল ভারতীয় জনসমাজকে। প্রত্যেকের জন্য ব্যবস্থাপক সভায় অ াসন সংখ্যা নির্দিষ্ট করে দিল। এটা করল ১৯৩৫-র শাসন সংস্কারে। ভারতীয় জাতিকে (nation) লম্বালম্বিভাবে ভাগ করলধর্মীয় সম্প্রদায় হিসাবে আর আড়াআড়িভাবে ভাগ করল জাত ইত্যাদি হিসাবে। যেভাবে পার যেখান পার বিভ াজন প্রক্রিয়া চালু রাখ। তাতেই মঙ্গল হবে ভারতবাসীর -- এরকম একটা বাতাবরণের সৃষ্টি হল। এই প্রচেষ্টা অব্যাহত থ াকল ১৯৪৭ সাল অবধি।

বৃটিশ শাসককুলের এই মহতী প্রচেষ্টা বৃথা যায়নি। তারা প্রচুর সাহায্য পেলেন মুসলিম লিগ নেতৃবৃন্দের কাছ থেকে। জ াতীয়তাবাদী সংগ্রামের বিদ্ধে সাম্প্রদায়িকতাবাদ অস্ত্র হিসাবে ব্যবহৃত হওয়ায় অবস্থা খুবই জটিল হয়। হিন্দু - মুসলম ানদের ভিতর পারস্পরিক আস্থাহীনতা ক্রমশই উদ্বেগের কারণ হয়ে ওঠল। দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে সম্পর্ক উত্তরোত্তর তিক্ত হয়। মুসলিম লিগ নেতৃবৃন্দের সঙ্গে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস নেতৃবৃন্দের প্রায় সব ব্যাপারেই মতে অমিল হতে আরম্ভ করল -- যেন তারা দুই মের বাসিন্দা। মুসলিম লীগনেতৃবৃন্দ অবিরাম চেষ্টা করতে থাকেন যাতেন যাতে মুসলমানদের অ ালাদা অস্তিত্ব বজায় রাখা যায়, সর্বক্ষেত্রে এবং সর্ব জায়গায়। মুসলমানদের জন্য আলাদা রাষ্ট্র আদায়ের দিকে তারা ধ াপে ধাপে এগিয়ে চলেন।

১৯৪০ -র ২৩ শে মার্চ মুসলিম লীগের লাহোর অধিবেশনে পাকিস্থান দাবী সর্বপ্রথম তোলা হয় এবং আট বছরের আগেই সেটা বাস্তবে পরিণত হয়। এই দাবীর সপক্ষে বলতে গিয়ে জিন্না বলেন ---

Islam and Hinduism are not religions in the strict sense of the word, but are, in fact, different and distinct social orders. The Hindus and the Muslims have different religions. The Hindus and Muslims belong to different religious philosophies, social customs and literatures. They neither intermarry nor interdine together, and indeed, they belong to two different civilizations which are based mainly on conflating ideas and conceptions. Their aspects on life and of life are different; it is quite clear that Hindus and muslims derive their inspiration from different sources of history. They have different epics, different heroes and different episodes.Very often, the hero of one is a foe of the other and likewise, their victories and defeats overlap. To yoke together two such nations under a single state, one as a numerical minority and the other as majority, must lead to growing discontent and final destruction of any fabric that may be so built up for the government of such a state ……mussalans are not a minority as it is commonly known and understood….Mussalmans are a nation …and they must have, their homeland, their territory, their state.

।। সাত ।।

বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনের শতবর্ষে সেই আন্দোলনের তাৎপর্য খুব বেশি কারণ আজ আবার ভারতের অখণ্ডতা বিপন্ন হচ্ছে নানা স্থানে। বোধ হয় ১৯০৫ - এর মানুষগুলো অনেক বেশি ভারতীয় ছিল আমাদের তুলনায় আমরা সবাই ক্ষুদ্র স্বার্থ চরিতার্থ করার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করেই যাচ্ছি এই ভারত ভূমিখণ্ডকে আরও টুকরো টুকরো করার জন্য। ইতিহাস থেকে যদি শিক্ষা গ্রহণ করতেই হয় তাহলে পর্যালোচনা করতেই হবে কেন আমরা ব্যর্থ হলাম ১৯৪৭-এর ভারত তথা বঙ্গ বিভাগ রদ করতে। আর ঠিক এখান থেকেই আমাদের শিক্ষা নিতে হবে, ভারতে বসবাসকারী ভিন্ন ভিন্ন ধর্মের, বর্ণের ও ভাষাভাষী মানুষের মধ্যে এক বৃহত্তর ঐক্য সৃষ্টির সন্ধানের মাধ্যমে কেমন করে আমরা দেশকে রক্ষা করব আরো টুকরো টুকরো হয়ে যাওয়ার হাত থেকে।

ভারত ভাগ হল ১৯৪৭ সালে। মুসলমান নেতৃবৃন্দ মুসলমানদের জন্য আলাদা রাষ্ট্র চেয়েছিলেন -- তা' তারা পেয়েও যান। কিন্তু তাতে কি হিন্দু মুসলমানদের মধ্যে পারস্পরিক সম্বন্ধের কোনো উন্নতি হয়েছে নাকি আরও অবনতি হয়েছে? দেশভাগের দ্বারা হিন্দু - মুসলমান সমস্যার সমাধান হবার নয়, সমাধান হয়ও নি। দেশভাগের পরেও ভারতে কোটি কোটি মুসলমান থেকে যায় -- জনসংখ্যার নিরিখে পৃথিবীর দ্বিতীয় সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমান বাস করে ভারতে। আসলে ভারতকে হিন্দু মুসলমানের ভিত্তিতে যে ভাবেই ভাগ করা হোক না কেন হিন্দু - মুসলমানকে পাশাপাশি বাস করতেই হবে। ভারত ভাগ হবার পর অনেকেই চেয়েছিলেন ধর্মীয় সম্প্রদায়গত যে বিভেদ তা' আর ভারতে থাকবে না, কিন্তু তা কি হল হিন্দু - মুসলমানদের মধ্যে যে ফাটল বৃটিশ রাজত্বে তৈরি হয়েছিল তা কি ভরাট করতে পারা গেল? কিন্তু এরকম কেন হল? আজও কেন হিন্দু - মুসলমান ধর্ম ও সম্প্রদায়ের প্রশ্ন এত স্পর্শকাতর। এত স্বাতন্ত্রবাদী, এত ভিন্ন ভিন্ন চিন্তায় মগ্ন? হিন্দু হিন্দুই রয়ে গেল। মুসলমান আজ আবার সম্প্রদায়ের চিন্তায় প্রখর হয়ে উঠেছে।

শুধু ধর্মের দোহাই দিয়ে নয়, জাতপাতের দোহাই দিয়েও আজ রাজনীতি করা হচ্ছে বহু স্থানে। জাত - ভিত্তিক রাজনৈতিক দল গজিয়ে উঠেছে অনেক জায়গায়। ‘Cast you vote’ না বলে বলা হচ্ছে ‘স্ফন্দ্ব স্তুসত্ত্বজ্ঞ ন্তুব্দন্দ্ব’। যখন ভোটের সমীক্ষা করা হয় তখন ধর্মীয় সম্প্রদায় ও জাতপাত ভিত্তিক ভোটের কথাই বলা হয়। যেন আমরা ধর্ম এবং জাতপাত ছাড়া আর কিছুই ভাবতে পারি না। রাজনৈতিক দলগুলিও, বাম ডান নির্বিশেষে যখনই তাদের প্রার্থী ঠিক করে তখন তার জেতার ক্ষমতা নির্ধারণ করে সেই প্রার্থীর ধর্মের এবং জাতের লোক সেই নির্বাচকমণ্ডলীতে কত আছে তার উপর। যেহেতু সেই প্রাথী এক বিশিষ্ট ধর্ম কিংবা জাতের অর্ন্তভুক্ত সেইজন্যই সেই ধর্মের কিংবা জাতের সমস্ত লোকেরই দায়িত্ব হচ্ছে তাকে ভোট দেওয়া, যেন তাকে ভোট দেবার জন্য সকলেই উন্মুখ হয়ে আছে। এটাই যদি প্রকৃত অবস্থা হয় তা হলে তো গণতন্ত্রই প্রহসনে পরিণত হবে।

আমাদের রাজনৈতিক কোন দলই জাতিভেদে, সাম্প্রদায়িকতা এই সব নিয়ে মন প্রাণ দিয়ে কখনো কোন আন্দোলন করেনি

তারা সাম্প্রদায়িকতা জাতিভেদ এগুলোকে কৌশলগত তথ্য হিসাবে মেনে নিয়ে তাদের নিজেদের সুবিধামত দলীয় রাজনীতি পরিচালনা করেছেন। এই দলাদলির বাইরে আমরা কিভাবে একটা ঐক্যবদ্ধ ভারতীয় সংস্কৃতি গড়ে তুলতে পারি আজকে আদি বঙ্গভঙ্গের একশো বছর কেটে যাওয়ার পর এই প্রশ্নটাই বড় হয়ে দেখা দিচ্ছে।

ব্রিটিশ শাসকরা 'বিভেদ ও শাসন' এই নীতি গ্রহণ করেছিল তাদের রাজ্যপাট চালানোর তাগিদে। স্বাধীন ভারতের শাসকশ্রেণীওকি সেই নীতি আঁকড়ে ধরে রইল যাতে তারাও পরম নিশ্চিন্তে নিপদ্রবে রাজ্যপাট চালিয়ে যেতে পারেন? সব শাসক শ্রেণীর চরিত্রকি এক? বর্তমানের রাজনীতি লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যে ভারতীয় ঐক্য নয়, সেই ব্রিটিশদের মতই একইভাবে প্রায় সমস্ত রাজনৈতিকদলগুলি তাদের নিজেদের টিকে থাকার স্বার্থ ধর্মীয় সম্প্রদায়গুলিকে ব্যবহার করে যাচ্ছে। ভিন্ন ভিন্ন ধর্মের মানুষের ধর্মান্ধতা এবং সাম্প্রদায়িক মনোভাব বজায় থাকলেই অসম আর্থসামাজিক এবং রাজনৈতিক কাঠামো থেকে আম জনতার দৃষ্টি সরিয়ে রাখা সম্ভব হবে। আর এভাবেই অটুট থাকবে শাসক শ্রেণীর শ্রেণীস্বার্থ।

পরাধীন ভারতের হিন্দু মুসলমান দাঙ্গার জন্য দায়ী করা হত ব্রিটিশ শাসকদের। স্বাধীন ভারতে আজ যে রোজই সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হচ্ছে হয় এই রাজ্যে নয় ওই রাজ্যে তার জন্যও কি এখনও বৃটিশ রাজই দায়ী নাকি আমাদের বর্তমান রাজনীতি দায়ী। প্রকৃতপক্ষে রাজনৈতিক দলগুলি বিশেষ করে শাসক দলেরা নিজেদের কায়েমি স্বার্থ চরিতার্থ করবার উদ্দেশ্যে অনেক সময়ই পূর্ব - পরিকল্পনা অনুযায়ী মৌলবাদী শক্তিগুলিকে প্রত্যক্ষ কিংবা পরোক্ষ ভাবে উৎসাহ যোগায়। যদি আমরা তর্কের খাতিরে ধরেও নি যে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাহাঙ্গামার পিছনে কোন রাজনীতিকদের বা রাজনৈতিক দলের প্রত্যক্ষ বা প্রচ্ছন্ন কোন মদতই নেই, যদিও এর উন্মাদনাই সত্যি, তবে তারা যে প্রত্যেকেই এই দাঙ্গা থেকে রাজনৈতিক ফসল তুলতেই ব্যস্ত তাতো আমরা রোজই দেখতে পাচ্ছি। তা সে গোধরা এবং গোধরা পরবর্ত্তী দাঙ্গাই হোক, দিল্লীতে শিখ - বিরোধী দাঙ্গাই হোক কিংবা ভগলপুরের দাঙ্গাই হোক। দাঙ্গা এত বেশি জায়গায় হচ্ছে যে কখন, কোথায়, কেন এই দাঙ্গা হবে তা বলা মুশকিল হয়ে পড়েছে। এর কারণটা যদি এক কথায় বলতে হয় তবে বলতে হবে যে আজ আর কেউই ভারতবর্ষের সামগ্রিক স্বার্থের কথা চিন্তা করে না। আজকে আমরা সকলেই 'মাত্র' 'কিছুটা' ভারতীয়, ততটুকুই 'ভারতীয়' ভাবতে পারি। এর থেকে মুক্তি বোধহয় আর কোনদিনই হবে না কারণ আমরা 'Catch 22'চক্রে পড়ে গিয়েছি।

এই অবস্থা থেকে মুক্তি পাবার সুযোগ যে একেবারেই আসেনি তা নয়। সে সুযোগ এসেছিল ১৯৪৭-এ যখন ভারতবর্ষ ভাগ হয় ধর্মের ভিত্তিতে। তখনকার ভারতীয় নেতৃবৃন্দ স্বপ্ন দেখতেন এক শোষণহীন, জাতপাতহীন, ধর্মীয় সম্প্রদায়হীন ভারতের। যেখানে থাকবে ধর্ম - বর্ণ - সম্প্রদায় নির্বিশেষে নারীপুষের সমান অধিকার, যে ভারত বিশ্বকে দেখাবে 'সাম্য, মৈত্রী ও স্বাধীনতার' পথ। তাঁরা সেই লক্ষ্য পূরণের সুযোগ পেয়েছিলেন ভারতীয় সংবিধান প্রণয়নের মধ্য দিয়ে। যদিও তাঁদের লক্ষ্যের মধ্যে কোন খাদ ছিল না, কিন্তু তাঁরা সেই লক্ষ্যে পৌঁছতে পারলেন না। কারণ তাঁরা সেই লক্ষ্যে পৌঁছতে যে বাহন ব্যবহার করলেন সেই বাহনটাই করল তাঁদের লক্ষ্যভ্রষ্ট। তাঁরা চেয়েছিলেন 'সেক্যুলার' ভারতবর্ষ, কিন্তু সেটা পাবার জন্য তাঁরা বাহন হিসাবে নিয়েছিলেন সাম্প্রদায়িকতাকেই। তাঁরা চেয়েছিলেন এক জাতপাতহীন সমাজ। কিন্তু সেটা করতে গিয়ে তাঁরা ব্রিটিশ রাজার মতনই জন্ম দিলেন আর একটি জাতের Other Backward Class মতান্তরে Other Backward Caste. তাই ভারত আজ সাম্প্রদায়িক শক্তির ও জাতপাতের লীলাভূমি হয়ে উঠেছে। এ ভারত নিশ্চয়ই তাঁরা চাননি।

এটা কেন হলো তার একটা সংক্ষিপ্ত আলোচনা বোধহয় অপ্রাসঙ্গিক হবে না। ভারতীয় সংবিধান রচনার মুহূর্তে সকলেই আশা করেছিলেন যে ভারতে আর সাম্প্রদায়িকতার বিভেদ থাকবে না, জাতগত বিভেদ থাকবে না। জাত - বর্ণ - ধর্মহীন ভারত গঠিক হবে। কিন্তু তা' হলো না। এরজন্য কি তখনকার নেতৃবৃন্দ এবং তাঁদের মানসিকতা কোনভাবে দায়ী? তাঁরা ভাবলেও তাঁরা যে সংবিধান রচনা করলেন তা' হল 'সেক্যুলার', যদিও 'সেক্যুলার' কথাটি সংবিধানে স্থান পায় ১৯৭০ সালে।

ভারতে ধর্মের প্রাধান্য চিরদিনের। এখানেই জন্ম নিয়েছে সনাতন হিন্দু ধর্ম। এবং বৌদ্ধ, জৈন ও শিখ ধর্ম। প্রায় সমস্ত ধর্মগুরাই এখানে কালাতিপাত করেছেন। আবার এই ধর্মের নামেই নানা বিভেদ, নানা বাদ - বিসম্বাদ। তাই তৎকালীন ভারতের রূপকারেরা ঠিক করলেন ভারত হবে 'সেক্যুলার'। 'সেক্যুলার' কথাটার অর্থ হচ্ছে ধর্মের সঙ্গে সম্পর্কহীন, পারম

ার্থিক সম্পর্কহীন, জাগতিক ব্যাপার। অর্থাৎ রাষ্ট্র ধর্মের সঙ্গে কোন সম্পর্ক রাখবে না, ধর্ম রাষ্ট্রশক্তির হাতিয়াররূপে ব্যবহার করা যাবে না। ধর্মের সঙ্গে কোন যোগ থাকবে না রাষ্ট্র পরিচালনায় এই 'সেক্যুলার' কথাটিরর আসল অর্থ। কিন্তু ভারতের ধর্মের এমনই সর্বাত্মক প্রভাব যে 'সেক্যুলার' কথাটারনিহিতার্থই পালটে গেল। এখানে 'সেক্যুলার' কথাটা ব্যবহৃত হল ধর্ম - নিরপেক্ষতা বা সর্বধর্মের প্রতি সমদৃষ্টি বোঝাতে। যদি ধর্মেরপ্রতি দৃষ্টিই দেওয়া যেতে পারে তা সে যতই সমান হোক না কেন --- তবে সেই দৃষ্টি যে একটু আধটু এদিক এদিক হয়ে গিয়ে কোন বিশেষ ধর্মের প্রতি আনুকুল্য দেখাবে না তার কি কোন স্থিরতা আছে? বস্তুত ভারতে জন্মগ্রহণ করল এক নতুন 'সেক্যুলর' ভাবধারা --- যার অর্থ দাঁড়াল রাষ্ট্রীয় জীবনে সব ধর্মের প্রত্যেক মানুষের নিজ নিজ ধর্মের প্রতি অন্ধ অনুগত্যকেই প্রশ্রয় দেওয়া।

প্রকৃত 'সেক্যুলার' রাষ্ট্র সংবিদান এবং রাষ্ট্রীয় আইনে এসব কিছু থাকা উচিত নয় যারা দ্বারা ধর্মের ভিত্তিতে রাষ্ট্র মানুষে মানুষে পার্থক্য রচনা করতে পারে। কিন্তু আমরা ধর্মীয় সংখ্যালঘুকে সাংবিধানিক স্বীকৃতি দিলাম। সাম্প্রদায়িক কথাটার অর্থ যেমন ধর্মীয় সাম্প্রদায়িকতা হয়ে গেছে তখনই সংখ্যালঘু কথাটার অর্থ হয়ে গেছে ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের। বিশেষ করে মুসলিম সম্প্রদায়কে। যেমন খবরের কাগজে 'মুসলিম সম্প্রদায়' ও সংখ্যালঘু সম্প্রদায়' এক হয়ে গেছে। যদি ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের সাংবিধানিক অস্তিত্ব কি ভাবে থাকে,যেখানে ধর্মীয় সম্প্রদায়েরই অস্তিত্ব নেই। যে রাষ্ট্র এভাবে প্রকৃতপক্ষে তার নাগরিকদের 'সংখ্যালঘু' এবং সংখ্যাগু' হিসাবে চিহ্নিত ও বিভক্ত করে তাকে আদৌ 'সেক্যুলার' বলে যায় কিনা? সে সন্দেহ থেকেই যাচ্ছে কারণ সেই রাষ্ট্র ব্যক্তি মানুষের জন্মলব্ধ ধর্মের মাপকাঠিতেই তার রাজনৈতিক ও আর্থ - সামাজিক স্থানাঙ্ক নির্ধারিত করছে।

এই মতামত অনেকেই আগে ব্যক্ত করেছেন। তবে আশার কথা এবার ধর্মের ভিত্তিতে কোনও সম্প্রদায়কে সংখ্যালঘু হিসাবে স্বীকৃতি দেওয়া প্রথা তুলে নেওয়ার পক্ষে মত দিল সুপ্রিম কোর্ট গত ১০ই আগস্ট এক মামলার রায়ে। ভারতের মতো গণতান্ত্রিক দেশে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের তালিকার প্রয়োজন নেই বলে সর্বোচ্চ আদালত মনে করে। বরং এমন সামাজিক পরিস্থিতি সৃষ্টি করার দিকেই নজর দেওয়া উচিত, যেখানে সংখ্যালঘু বা সংখ্যাগু বলে আলাদা করে কারও অধিকার রক্ষার প্রয়োজন হবে না। ধমীয় গোষ্ঠীকে সমপ্রদায় হিসাবে স্বীকৃতি দিলে দেশ তত্তা জাতিই দুর্বল হয়ে পড়ে। আপাতের সমস্যায় এমনিতেই জর্জরিত ভারতীয় সমাজে এই ভাবে ধর্মীয় তকমা বিভেদকামী মানসিকতাকেই উস্কে দেয়। আদালতের মত, হিন্দু সম্প্রদায়ের মধ্যে সকলেই সংখ্যালঘু। সংখ্যার বিচারে পিছিয়ে থাকার কথা বলে সংবিধানে স্বীকৃত বিশেষ সুবিধা নেওয়ার জন্য অনেকে এমন করে থাকে। সংখ্যালঘু সম্প্রদায়গুলি যদি একে অপরের থেকে বিপদের আশঙ্কায় ভাগে, তা হলে ভয় ও অবিশ্বাসের পরিবেশ তৈরি হবে, আর তাতে দেশের ঐক্যই বিপন্ন হবে বলে আদালত মতপ্রকাশ করেছে।

নিজ ধর্মাচরণ করা প্রত্যেকেরই সাংবিধানিক মৌলিক অধিকার। কিন্তু আমাদের 'সেক্যুলার' নেতৃবৃন্দ আরও এক ধাপ এগিয়ে ধর্মপ্রচারকেও রাখলেন মৌলিক অধিকারের মধ্যে। সংবিধান প্রণয়নের সময় খ্রীষ্টান সম্প্রদায়ের নেতৃবৃন্দ বললেন তাঁদের সম্প্রদায়ের জন্য তাঁরা আর কোন দাবী দাওয়া করবেন না যদিও তাদের ধর্মপ্রচারের অধিকার দেওয়া হয়। যেহেতু ধর্মপ্রচার তাঁদের ধর্মীয় অনুশাসনের মধ্যেই পড়ে। কিন্তু এই অধিকার শুধু খ্রীষ্টান সম্প্রদায়কে দেওয়া হয়নি, দেওয়া হয়েছে সব ধর্ম প্রচারের মাধ্যমে ধর্মান্তকরণ করা। তাই ধর্মপ্রচারের মাধ্যমে ধর্মান্তকরণের অধিকার প্রকারান্তরে স্বীকার করে নেওয়া হল। পৃথিবীর আর কোন সেক্যুলার সংবিধানে এই অধিকার দেওয়া হয়নি।

যেখানে সংখ্যার মাহাত্ম্য খুব বেশি সেখানে সব ধর্মীয় সম্প্রদায়ই চাইবে তার সংখ্যা যেন না কমে বিশেষত ধর্মান্তরকরণের ফলে। সেই জন্য প্রতিটি সম্প্রদায়ই খুব সজাগ এবং এর ফলে জন্ম নেয় অন্য সম্প্রদায়ের প্রতি ভীতি, ঘৃণা, আক্রোশ, বিদ্বেষ । বর্তমান ভারতে ধর্মান্তকরণ এবং পুনরায় ধর্মান্তকরণ নিয়ে প্রায়শই দাঙ্গাহাঙ্গামা হচ্ছে এবং সামাজিক পরিবেশও কলুষিত হচ্ছে। যেহেতু ধর্মান্তকরণের ফলে বিজাতীয় মনোভাবের উদ্ভব হয় তাই মহাত্মা গান্ধী আইন করে ধর্মান্তকরণ বন্ধ করতে বলেছিলেন। যদি তাঁর কথা শোনা হত তাহলে কি সম্প্রদায়গত বিভেদ আর একটু কমত না?

ভারতীয় সংবিধান একটি অভিন্ন দেওয়ানী আইন তৈরি করতে বলেছে। কিন্তু গত ৫৫ বৎসরেও তা' করা সম্ভবপর হল না। সর্বোচ্চ আদালত অবশ্য মাঝে মাঝে কেন্দ্রীয় সরকারকে তার সংবিধানিক দায়িত্বের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। এই বিষয়টি মুসলমান সম্প্রদায়ের কাছে খুবই স্পর্শকাতর বিষয়। যে আইন তৈরি করাই যাচ্ছে না তখন এই সংবিধানিক

অনুচ্ছেদটি তুলে দিলে কি সামপ্রদায়িক পরিবেশটা আরও সুস্থ হত না? আর. কে. এস মুন্সি তো সেই ১৯৪৮ সালে ২৩ শে নভেম্বর বলে গিয়েছেন যে যদি এই অনুচ্ছেদটি সংবিধানে না থাকে তাহলেও কোন ক্ষতি নাই কারণ সংবিধানের ২৫ (২) (ক) অনুচ্ছেদ অনুযায়ী সংসদ যে কোন সময় অভিন্ন দেওয়ানী আইন তৈরি করতে পারে।

আর একটা বিষয় এখানে স্মরণ করা যেতে পারে। ১৯৩৫ -এর আইন অনুযায়ী সমস্ত ধর্মীয় সম্প্রদায়ের জন্য আসন সংরক্ষিত ছিল কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক আইন সভায়। ভারতীয় সংবিধান তৈরির সময় তখনকার নেতৃবৃন্দ কেন্দ্রীয় এবং রাজ্যগুলির আইনসভায় প্রত্যেক ধর্মীয় সম্প্রদায়ের জন্য আসন সংরক্ষণ ব্যবস্থা রেখেছিলেন তাদের জনসংখ্যার অনুপাতে --- তবে কোন সম্প্রদায়ের জন্যই স্বতন্ত্র নির্বাচকমণ্ডলীর ব্যবস্থা রাখে নি। এই বন্দোবস্ত ভারতীয় সংবিধানে প্রায় অর্ন্তভুক্ত হতে যাচ্ছিল যদি না দুই জাতীয়তাবাদী মুসলিম এবং ভারতীয় খ্রীষ্টান নেতা - বিহারের তেজামূল হোসেন এবং পশ্চিমবঙ্গের ডাঃ হরেন্দ্রকুমার মুখার্জ্জী এর বিদ্ধে খে দাড়াতেন। যাঁরা শুধুবাধাই দেন নি, নিজেদের সম্প্রদায়ের জনমত সংগঠিত করলেন এই বন্দোবস্তের বিদ্ধে -- যার ফলে সেটি আর সংবিধানের অন্তর্গত হতে পারল না। সেই ব্যবস্থা যদি সত্যিই সংবিধানে ঢুকতে তা' হলে হত সোনায় সোহাগা। এইরকম আরও অনেক ফাঁক ফোকর আছে ভারতীয় সংবিধানে যাতে সাম্প্রদায়িক বিভেদটা জিইয়ে রাখতে সাহায্যই করছে।

বর্তমানে ভারতবর্ষ দাঁড়িয়ে আছে এক আগ্নেয়গিরির উপর যেটা যে কোন সময়ে উদগীরণ করতে পারে ভয়াবহভাবে। ১৯০৫ থেকে আমরা কোন শিক্ষা নিতে পারিনি -- তাই ভারতভাগ হল ১৯৪৭ সালে। ১৯৪৭ সালের পরে প্রায় ৬০ বৎসর অতিক্রান্ত হয়েছে। কিন্তু সামগ্রিক পরিস্থিতি দেখে মনে হচ্ছে যেন সেই ১৯০৫ পরবর্তী সময়ের সমস্যাগুলি আস্তে আস্তে প্রকট হয়ে ভারতীয় রাজনীতির অন্দরমহলে চলে এসেছে এবং ভারতীয় রাজনৈতিক নেতারা সেই ১৯৪৭ - পূর্ববর্তী সময়ের মত এবারেও তার মোকাবিলা করতে অপারগ।

।। গ্রন্থসূত্র ।।

বঙ্গভঙ্গ শতবার্ষিকী সংকলন, The Kolkata Muncipal Gazette 2005

বজ্রশিখায় বাংলা --- বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনের শতবর্ষে সংকলন ঃ গণশক্তি, ২০০৫

স্বদেশি আন্দোলন ঃ বাংলা ও বাঙলি ঃ পরিচয়, মে - জুলাই, ২০০৫

হরিদাস মুখোপাধ্যায় ও উমা মুখোপাধ্যায়, স্বদেশী আন্দোলন ও বাংলার নবযুগ, ঃ কলিকাতা, দে'জ, ২০০৪

Partition of Bengal Significant Signposts, 1905-19 ed. Nitryapriya Ghash and Ashok Kumar Mukhopadhaya, Sahity Sansad, 2005

Anirban Kashyap : Communalism and Constitution New Delhi, : Lancers Books, 1982 – Disintegration and Constitution, New Delhi Lancers Books 1989

J.R. Maclane, Indian Nationalism and the early congress, Princeton, 1977

Bipan Chandra, Communalism in Modern India, Delhi Vikash Publishing House, 1986

M. K. Gandhi: Christian Missions and Their Plan in India, Ahmedabad, Navajiban Press 1941

সৃষ্টিসন্ধান

Phone: 98302 43310
email: editor@srishtisandhan.com